শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী।

তৃতীয় খণ্ড

ভুলুয়া প্রণীত

প্রকাশক

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,

হেড মাষ্টার, বনোয়ারীনগর হাই স্কুল,

পোঃ বনোয়ারীনগর, জেলা পাবনা।

প্রথম সংস্করণ

১৩৩৪ সাল

 মূল্য ২।০ দুই টাকা চারি আনা।

প্রকাশকের নিবেদন ঃ

মা মঙ্গলময়ীর মঙ্গলেচ্ছায়, তাঁহার সন্তানমণ্ডলের চিরবাঞ্ছিত, পরমাদরের পবিত্র গ্রন্থ, শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী, তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। যে অপূর্ব্ব ভাব-মন্দাকিনীর দুই ধারা, ইতিপূর্ব্বে প্রবাহিত হইয়া, সংসার-মরুক্লিষ্ট অসংখ্য নরনারীর বিশুষ্ক হৃদয়ে, অপার্থিব আনন্দরসের শীতলতা সঞ্চারিত করিয়াছে, তাহারই তৃতীয় ধারা, আজ আবার মাতৃনাম-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনের সুমধুর উচ্ছ্বাসময় কলতানে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া, ত্রিতাপদগ্ধ জীবজগতের উদ্ধারকল্পে প্রধাবিত হইল।

এই পুণ্যপ্রবাহের পীযূষ পানে দুর্ব্বাসনার জ্বালাময়ী তৃষ্ণার চিরোপশম ঘটিবে;—ইহার অমৃতময় স্পর্শনে শোকার্ত্তের দহ্যমান হৃদয়ে সান্ত্বনার শীতলতা প্রদত্ত হইবে;—ইহা অমরবাঞ্ছিত সুধার প্রস্রবণ; সেই প্রস্রবণধারায় অভিষিক্ত হইয়া কত শত ঊষর হৃদয়ক্ষেত্র ভক্তি বিশ্বাসের অলৌকিক এবং অপ্রাকৃতিক শস্যসম্ভারে সমলঙ্কৃত হইবে;—আর এই নিত্যানন্দময়ীর নামতরঙ্গিণীর প্রবলাকর্ষণে দিগ্‌ভ্রান্ত, বিপন্ন জীবনতরণী, সত্যপথের সন্ধান পাইয়া, পরমাশ্রয় পরাৎপরের দিকে অগ্রসর হইবার, সৌভাগ্য লাভ করিবে।

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে সনাতন আর্য্যধর্ম্ম আজ বড়ই দুর্দ্দশাপন্ন। যখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশসমূহ অজ্ঞানতা ও বর্ব্বরতার নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল, তখন এই ভারতবর্ষের আর্য্যসমাজ হইতেই সর্ব্বপ্রথমে জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সভ্যতার পবিত্র জ্যোতি সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল। যখন পৃথিবীর অন্যান্য জাতিসমূহ বন্য জন্তুর ন্যায় অন্ধজীবন যাপন করিত, তখন এই ভারতমাতার জ্ঞান বৈরাগ্যারূঢ় আর্য্যসন্তানগণই জীবনব্যাপী সাধনা দ্বারা—

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ।"

সেই পরব্রহ্মের প্রত্যক্ষানুভূতি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারা তত্ত্ব জানিয়া যে ধর্ম্মের চরমোৎকর্ষ সাধন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের অযোগ্য-বংশধর—আমাদিগের বিকৃত আচরণে বিশৃঙ্খল ও হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে। আজ এই জড়বাদের যুগে সেই প্রাচীন অধ্যাত্মবাদের মহিমা লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। যে শক্তিপূজাই একমাত্র আশ্রয়নীয়া, তাহা মাত্র গ্রন্থাদিতে গচ্ছিত রহিয়াছে। শক্তিতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তির অভাব ঘটিয়াছে। সত্যের অপলাপ ঘটিয়াছে। এই শ্রীগ্রন্থ সেই সত্যের মহিমা প্রচার করিতে প্রকাশিত। কাল ব্রহ্ম—কালই সত্য—কালই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের হেতু। আমরা কালেই আছি, কালেই হইয়াছি এবং কালেই বিলুপ্ত হইব। কালই আমাদের শ্রীকৃষ্ণ ;—

"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধ।"

কাল শক্তিমান ; কালী তাঁহার শক্তি। শক্তি আর শক্তিমানে কোন প্রভেদ নাই। প্রভু যীশুখৃষ্টের পূর্ব্বে, সমস্ত পৃথিবীতে আর্য্যগণ প্রদর্শিত এই শক্তিপূজাই বিদ্যমান ছিল। একই শক্তি নানা শক্তিমানরূপে, নানা মূর্ত্তিতে অর্চ্চিতা ছিলেন। শক্তিপূজা করিতে হইলেই শক্তিমানের পূজা প্রয়োজন, ইহাই স্থির সত্য। এই শ্রীগ্রন্থ সেই সত্য উপলব্ধি করাইবার হৃদয়গ্রাহী উপায়সমূহে উদ্ভাবিত।

বহু দেবতা বা বহু শক্তিমানের উপাসনা দ্বারা আমরা যে সেই একই মহাশক্তি বা পরব্রহ্মের উপাসক, তাহা আমরা বিস্মৃত হইয়াছি ; আমরা একই ব্রহ্মের বা পরমেশ্বরের পূজা করিতে বহু পরমেশ্বর গড়িয়া ফেলিয়াছি। উপাসনায় বিশৃঙ্খল হইয়াছি। "কাহাকে ভজি, কাহাকে ত্যাজি" অনেকে এই সংশয়ে পতিত হইয়াছি। যতদিন শক্তিতত্ত্বে না যাইব, ততদিন এই সংশয় দূরীকরণের সম্ভাবনা নাই ; ততদিন বিস্মৃত সত্যের সমুদ্ধারেও সামর্থ্য ঘটিবে না। এই পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ সেই সত্যরূপিণী শক্তিতত্ত্বের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ।

আমাদের মধ্যে অধিকাংশ স্থানে অর্চ্চনার উদ্দেশ্য হইয়াছে সংসার সুখ ও ঐশ্বর্য্য লাভ। যথার্থ ভক্তির উপাসনার প্রণালী তাই অনেক স্থানে উপেক্ষিত হইয়াছে। ভক্তিবিহীন পূজা কেবল বাহ্য আড়ম্বর ও লৌকিকতায় উৎসবময়। তাই আমরাও সত্য বিস্মৃত হইয়া "প্রীতিকামোপাসনার" মূল উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, পুরুষপরম্পরা কেবল বাহ্যাড়ম্বর ও লৌকিকতার মধ্যেই নিমগ্ন রহিয়াছি। চিরজীবন মৃণ্ময়ী মূর্ত্তিপূজাই করিতেছি, আর কল্পিত আচারের "আবৃত্তিকে"ই ধর্ম্ম বলিয়া—সাধনা বলিয়া বুঝিয়া আসিতেছি ;—কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও, সেই মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি যে চিন্ময়ী সত্ত্বার প্রতিমা মাত্র,—তাহা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করি না ;—সেই পরমাশ্রয় বিশ্বনাথের তত্ত্বানুসন্ধানে উপবেশন করি না ;—এমন কি পুরোহিতের করে অর্চনাভার অর্পণ করিয়া নিজ নিজ আত্মকথাও একবার শ্রীভগবানের শ্রীচরণকমলে নিবেদন করি না। আচরণের মূল উদ্দেশ্য যে চিত্তশুদ্ধি, তাহা বুঝিবার—বুঝাইবার কেহ নাই। কেবল প্রথারক্ষার নিমিত্ত, প্রচলিত আচার অবলম্বন করিয়া, সংস্কারবশে একটা অনুষ্ঠান করি মাত্র। আমরা—

"সত্য ছাড়ি পূজা করি সত্যনারায়ণে।
চিঁনি কলা দুধ গুলি খাই সর্ব্বজনে।
কোথা সত্যনারায়ণ মোরা বা কোথায় !
—নারায়ণ-কৃপা নাই মিথ্যার ধরায়।" ৪৮ পৃঃ।

মিথ্যার মোহময় লৌহ-কবল হইতে দুঃস্থ জীবকে মুক্ত করিয়া তাহার হৃদয়মন্দিরে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের মণিময় সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করাই এই পবিত্র গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ধর্ম্মের নামে যে কপটতা ও সংকীর্ণতার পঙ্কিল-স্রোত জন-সমাজের মধ্য দিয়া প্রবাহিত, তাহার উচ্ছেদসাধন করিতে এবং জনসমাজকে সত্য ও বিশ্বপ্রেমের পবিত্র প্রবাহে নির্ম্মল করিবার জন্যই আজ ধরাতলে এই সুধাময়ী মন্দাকিনীর

অবতারণা। শাস্ত্রবাদের অসদর্থ করিয়া, ও সাধনাচরণের মধ্যে মোহের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, যে সকল কদাচার ও ব্যভিচার সনাতন আর্য্যধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিয়াছে, তাহাদের অপসারণের জন্য এই পবিত্র গ্রন্থে শুদ্ধ-ভক্তিবাদের সমর্থন। অথবা ব্যভিচাররূপ মোহ-রাক্ষসের শিরচ্ছেদন পূর্ব্বক, আর্য্যক্ষেত্রে সত্য ও বিশ্বপ্রেমের পবিত্র রাজ্য স্থাপন জন্য, মাতৃপূজার দুর্জ্জয় অসি উত্তোলনপূর্ব্বক আজ এই গ্রন্থরূপে কালভৈরবীর আবির্ভাব। এই পবিত্র গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া বহির্ম্মুখ চিত্ত অন্তর্ম্মুখী হইবে;—আচারনিষ্ঠ সংসারধর্ম্মী বহু দেব-পূজার মধ্য দিয়া একেশ্বরবাদের নিগূঢ় রহস্য উপলব্ধি করিতে পারিবে;—এবং সাধনপথের প্রবর্ত্তকগণ ভক্তিবিশ্বাসে বলীয়ান্ হইয়া, ভগবানের দিকে দ্রুতগতি অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবে। ব্যভিচার—সূর্য্যোদয়ে কুয়াসার মত অন্তর্হিত হইবে।

যে পরাৎপর পরমেশ্বরের প্রকাশের সীমা নাই, তাঁহার ভাবেরও সীমা নাই। তিনি একাই অনন্ত,—অনন্ত বিশ্বই তিনি। তাই অনন্ত স্থানে অনন্ত ভাবে তিনি আরাধিত। তিনি কোথাও প্রভু, কোথাও সখা, কোথাও পিতা, কোথাও মাতা, কোথাও সন্তান, কোথাও নাথ বলিয়া আরাধিত। আর্য্য জগতে অনন্তকাল অনাদির আদি হইতে তাঁহার মাতৃভাব অবলম্বিত।

মার স্নেহ, মার সন্তানপ্রিয়তা, সন্তানের জন্য মার সর্ব্বস্ব ত্যাগ, সংসারে নিত্য দৃষ্ট,—নিত্য পরীক্ষিত। জগতে এমন জীব জন্তু নাই, যাহাদের জননী নাই। জননীশূন্য জন্তু ধারণার অতীত, কল্পনার অতীত। জীবমাত্রই জননীর কৃপায় ধৃতজীবন। আর্য্য সাধক তাই বিশ্বপতির বিশ্বজননী-ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া মাতৃভাবে ঈশ্বরোপাসনাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মাতৃপূজা অবলম্বন করিয়াছেন;—নিজে সিদ্ধিলাভ করিয়া অন্যকে পূজা পদ্ধতি অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

ভাবসিদ্ধ বৈষ্ণব মহাজনগণের মধ্যে পরমপুরুষ ও পরমাপ্রকৃতির মধুর ভাবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সমাদৃত। কিন্তু তাঁহাদের সেই মহা-ভাবের "মহাভাবস্বরূপিণী রাধাঠাকুরাণীর" লীলারহস্য অনুভব করিতে মায়াবদ্ধ জনসাধারণের অধিকার নাই। সেই অপ্রাকৃত মধুর লীলা, প্রাকৃত বিষয়াসক্ত ভাবভক্তিবিহীন মানবের পক্ষে সর্ব্বত্রই অবোধ্য; অজ্ঞ মানব সে লীলার অন্তর্নিহিত চিন্ময় রসতত্ত্বের মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া অনেক স্থলে বিপথগামী হয়। যে লীলা নির্ব্বিষয়ী ভাগবতজনের অনুভবনীয়, তাহা মায়াবদ্ধ মানবের বুদ্ধির অতীত।

কিন্তু মাতৃভাবতত্ত্বে সকলেই সমান অধিকারী। মাতৃস্নেহ কোন মানুষের অবিদিত নাই। যে মাতৃহীন, সে মাতৃস্নেহ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করে। কেবল গরু ঘোড়া শৃগাল কুক্কুরেরা দুধ ছাড়াইলে আর মাতৃস্নেহ স্মরণ রাখিতে পারে না। মাতৃস্নেহ মানুষের প্রাণের বল, মনুষ্যত্বের আরাধনীয়। ভাবসিদ্ধ মধুরভাবাশ্রিত বৈষ্ণব মহাজনগণও মাতৃভাবের সম্মান সর্ব্বপ্রথমে প্রদান করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য, প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য, এই মাতৃভাবে যেরূপ সর্ব্বোচ্চ সম্মান প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই পবিত্র গ্রন্থে অতি ললিত মধুর কবিতা কূজনে গীয়মান। মাতৃভাব যেমন নির্ম্মল, তেমন পবিত্র। প্রণবোত্থিত মা নাম মন্ত্রে চরিত্র নির্ম্মল হয়, চিত্তশুদ্ধি সম্পাদিত হয়, ভ্রাতৃভাবে বিশ্বপ্রেম জাগ্রত হয়, অপরাধের ভয় অন্তর্হিত হয়, প্রত্যেক রমণীকে বিশ্বজননীর প্রতিমা বলিয়া অনুভূত হয়, কামাদির প্রভাব অন্তর্হিত হয়। এই পবিত্র গ্রন্থে এই সকল বিষয় বিশদরূপে আলো-চিত হইয়াছে। ইহা মা নাম মন্ত্রের মহাতন্ত্র,—প্রেমভক্তি রসের অদৃষ্টপূর্ব্ব মহা ভাগবত।

যিনি আশৈশব মাতৃপূজায় অভ্যস্ত, বিশ্বজননীর নামে প্রেমে তন্ময়, যিনি মা নাম মন্ত্রে নিত্যসিদ্ধ, যিনি মাত্র যৌবনের প্রারম্ভে সৌভাগ্য-

কুণ্ডতীরে মাতৃভাবের পবিত্র উচ্ছ্বাসে অগণ্য সন্ন্যাসী ও যাত্রিগণকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন, জগজ্জননার সেই গরিষ্ঠ সন্তান,—অবধূত মণ্ডলের মহামান্য অগ্রগণ্য সাধক মহাপুরুষ শ্রীশ্রীভুলুয়াবাবার অমৃতময়ী লেখনীনিঃসৃত এই পবিত্র গ্রন্থ যিনি অধ্যয়ন করিবেন, তিনি ভিন্ন অন্য কেহ কেবল আমাদের বর্ণনায় ইহার ভাবমাধুর্য্য, অনুভবে সমর্থ হইবেন না। ইহার অধ্যয়নে ধর্ম্মাধর্ম্মের কলহাবসান হয়; অনর্থের নিবৃত্তি ঘটে; ইহার পুণ্যপ্রভায় সংশয়ের অন্ধকার বিদূরিত হয়। প্রবল দুর্ব্বাসনাক্ষিপ্ত মন মন্ত্রমুগ্ধ বিষধরের মত নিস্তেজ হইয়া শান্তভাব ধারণ করে। তন্ময় পাঠকের নিকট প্রতি প্রকৃতি-মূর্ত্তিতে পরমাপ্রকৃতির প্রত্যক্ষ প্রতিকৃতি প্রতিভাত হইয়া উঠে। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি পদার্থে সেই কুলকুণ্ডলিনী শক্তির অতীন্দ্রিয় লীলাভিনয় দর্শন করেন;—আর মহাকালীর বিশ্বরূপে নিমগ্ন হইয়া ধ্যানস্তিমিত নেত্রে অনুভব করেন—

"মাটী মোর প্রতি মাটী; প্রতি মা প্রতিমা।
প্রতি মা লইয়া বিশ্ব, বিশ্বই প্রতিমা।" ৭২ পৃঃ

শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী কেবল সম্প্রদায় বিশেষের গ্রন্থ নহে; ইহা দর্শন, তন্ত্র, পুরাণের রসতরঙ্গ;—কবিতায় অতি মধুর—সরল সুললিত কোমল কাব্য এবং মহাপুরুষগণের সুপবিত্র চরিতামৃত। উপাসনার সরল সহজ প্রণালীসমূহ ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে নানাবিধ কাল্পনিক উপন্যাস ও সত্য ঘটনা দ্বারা বক্তব্য বিষয় অতি উত্তমরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ভাবের পারিপাট্যে ভাষার চাতুর্য্যে ও কবিত্বের মাধুর্য্যে অতি উত্তম কাব্যের মধ্যে পরিগণিত, বিশেষতঃ বিশ্ব-জননীর সিদ্ধ-ভক্ত-সন্তানগণের জীবনীসমূহের পুণ্যজ্যোতিতে ইহার আদ্যন্ত সমুদ্ভাসিত। ইহা ধর্ম্মপ্রাণ পাঠকের নিকটে প্রাণপ্রিয়তম ভক্তমাল। সাম্প্রদায়িকতার মলিনতা ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

এই সুবৃহৎ গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের প্রকাশ জন্য আমরা, চুঁচুড়া নিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ পাল মহাশয়ের নিকটে, সর্ব্বতোভাবে কৃতজ্ঞ। তিনি উদ্যোগী না হইলে এই জগন্মঙ্গলকর পবিত্র গ্রন্থ প্রকাশ করা দুঃসাধ্য হইত। এই সদনুষ্ঠানে তাঁহার আগ্রহ, পরিশ্রম, চেষ্টা ও স্বার্থত্যাগের প্রশংসা করিবার যথাযোগ্য ভাষা, ভাষায় দুষ্প্রাপ্য। তিনি মা নাম মন্ত্রেব মহাসাধক—ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতপরায়ণ,—কঠোর সংযমে সমাসীন এবং পরম ভাগবত। মা মঙ্গলময়ী বিশ্বজননীর নিত্যাশীর্ব্বাদে তিনি অন্বিত হউন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

সূচীপত্র

ষষ্ঠ দিন।

প্রথম পরিচ্ছেদ——সর্ব্ববিদ্যা সর্ব্বানন্দের পরিচয়—তাঁহার সিদ্ধিলাভের বৃত্তান্ত—ব্রহ্মময়ী সর্ব্ববিদ্যার প্রভাবে নিরক্ষর বদনে পাণ্ডিত্যপূর্ণ স্তব—উত্তরসাধক শ্বপচ পূর্ণানন্দের স্তোত্র।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ——গুরুবাদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ——দিব্যভাব; শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের মাতৃভক্তি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ——শ্রীঅচল্; ইন্দ্র-বলী সংবাদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ——হিংসা ত্যাগই মহত্ব; দৈবের সূক্ষ্ম বিচার।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ——শ্রীশ্রীভক্তনাম-সংকীর্ত্তন; শিবশক্তি তত্ত্ব; ব্রহ্মচর্য্য; হিতোপদেশপূর্ণ সঙ্গীত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ——আগমনী।

পরিশিষ্ট——নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী; কামাখ্যা।

Bina press.
44, Amherst Street

শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী।

ষষ্ঠ দিন

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যা ভূতান্ বিনিপাত্য মোহজলধৌ
সংনর্ত্তয়ন্তী স্বয়ং।
যন্মায়াপরিমোহিতা হরিহর—
—ব্রহ্মাদয়ো জ্ঞানিনঃ॥
যস্যা ঈষদনুগ্রহাৎ করগতং
যদ্যোগিগম্যং ফলং।
তুচ্ছং যৎপদ সেবিনাং হরিহর—
—ব্রহ্মত্বম্ তস্যৈ নমঃ॥ ১

১। যা দেবী ভূতান্ মোহজলধৌ বিনিপাত্য স্বয়ং সংনর্ত্তয়ন্তী, হরিহরব্রহ্মাদয়ঃ যস্যা মায়য়া পরিমোহিতাঃ, জ্ঞানিনঃ অপি পরিমোহিতাঃ, যস্যা ঈষদনুগ্রহাৎ যোগিগম্যং যৎ ফলং তৎ করগতং, যৎপদ সেবিনাং হরিহরব্রহ্মত্বং তুচ্ছং, তস্যৈ নমঃ॥

যিনি ভূতসমূহকে মোহসমুদ্রে পাতিত করিয়া নিজে নৃত্য করেন, হরিহর ব্রহ্মাদি যাঁহার মায়ায় বিমোহিত, তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণও যাঁহার মায়ায় বিমোহিত,

জয় জয় জগদ্ধাত্রী যোগেন্দ্র-বাঞ্ছিতা
ত্রিজগজ্জননী নৃত্যকালী।
দৃশ্যমান এ বিশ্বের কেন্দ্র স্বরূপিনী,
পদে বিশ্বনাথ ইন্দুভালী ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব বহ্নি বরুণ পবন,
ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য যম যত,
তাঁর শক্তি প্রভাবে সকলে শক্তিমান,
তাঁর আজ্ঞা বহে, অবিরত।
যক্ষ রক্ষ দানব গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর,
ভূচর খেচর জলচর,
তাঁহার কৌশলে আত্মবিস্মৃত সকলে,
কাল-চক্রে ভ্রমে নিরন্তর ॥
শক্তি ভক্তি জ্ঞান বুদ্ধি প্রতিভা প্রয়াস
ধৃতি স্মৃতি লক্ষ্মী লজ্জা ভয়,
সমস্ত সে জীবান্তরে, জগ রঙ্গমঞ্চে,
যাহে জীব করে অভিনয় ॥
অত্যুচ্চ সাধন বলে তাঁহার দর্শনে,
এ সংসারে যে কৃতার্থ হয়,
ঈশ্বরের তুল্য সেই, অস্বীকারি যদি,
অপরাধী ভুলুয়া নিশ্চয় ॥

জিজ্ঞাসেন শিবানন্দ, "ব্রহ্মময়ী কালী
প্রত্যক্ষ দর্শনে এ সংসারে

যাঁহার বিন্দুমাত্র অনুগ্রহে যোগিগণের যোগলভ্য ফলসমূহ করতলগত হয়, এবং যাঁহার ভক্তগণ ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবত্বকেও তুচ্ছ বোধ করেন, সেই জগজ্জননীকে নমস্কার করি।

সমর্থ কি হয় নর ?—উদ্বাহু বামন
　　পারে কি সুধাংশু ধরিবারে ?”
উত্তরে সন্তান, “নরে অসমর্থ হ’লে,
　　অর্চ্চনা কে করিত তাঁহার ?
দুগ্ধ মথি মাখন যদি না উদ্ভাসিত
　　মন্থনে বাসনা হ’ত কার ?
আপাতঃ দর্শনে কি না গণি অসম্ভব ?
　　—অসম্ভব সিন্ধু উত্তীরণ,
—অসম্ভব ধরাগর্ভে খনির অস্তিত্ব,
　　—অসম্ভব মণি-উত্তোলন ?
সিন্ধুর অতল তলে রহে রত্নরাজী,
　　আমাদের বিশ্বাসে না আসে।
—ডুবরী সন্ধান জানে, পশি সুকৌশলে
　　রত্ন তুলি আনে অনায়াসে ॥
সে প্রকার আছে ভক্তি সাধনার বিধি,
　　যাহে তাঁয় করিয়া দর্শন,
কৃতার্থ হইয়া ভক্ত, অন্য সাধকের
　　জন্য করে পথ নির্দ্ধারণ ?

তার সাক্ষী শ্রীরামপ্রসাদ একজন,
　　অসম্ভব ইচ্ছামৃত্যু যাঁর ;
আর সাক্ষী নরোত্তম দাস নরোত্তম,
　　বৈষ্ণবের বক্ষে রত্নহার।
শ্রীগরীব ব্রহ্মচারী, শ্রীকমলাকান্ত,
　　আর ভক্ত মহেশ মণ্ডল,
সর্ববিদ্যা সর্বানন্দ, ভবাণী ঠাকুর,
　　সর্বজন শ্রবণ-মঙ্গল।”

জিজ্ঞাসেন শিবানন্দ, "কে সে মহাজন,
সর্ব্ববিদ্যা উপাধি যাঁহার, ?"
উত্তরে সন্তান, "সিদ্ধ সাধক মণ্ডলে,
সর্ব্বানন্দ নমস্য সবার।"
বলেন শ্রীনিত্যানন্দ, "কহ বিস্তারিয়া
ভক্তের চরিত্র ভাগবত।"
উত্তরে সন্তান,—নতশির, কৃতাঞ্জলি,—
—স্থিরকর্ণ সর্ব্ব সভাসদ্।
পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর ক্রোড়ে পূর্ব্বস্থলী,
পূর্ব্বাপর প্রসিদ্ধ নগর,
বহু ভক্ত সাধকের আবির্ভাব জন্য
গণ্য যাহা তীর্থের সোসর।
সে নগরে বসতি করিত পূর্ব্বকালে,
বাসুদেব ভট্টাচার্য্য নাম ;
তপোনিষ্ঠ, বশিষ্ঠ সমান আত্মজয়ী,
সুনির্ম্মল ভক্তিরসধাম।
একদিন গঙ্গাগর্ভে নিশিথ সময়ে,
গঙ্গা তীরে ধ্যানস্থ যখন,
সুপ্রসন্না ব্রহ্মময়ী দৈববাণী ছলে,
আশ্বাসিল করি সম্বোধন॥
"ভক্ত তুমি, তুষ্টা আমি তব তপস্যায়,
পাবে তুমি আমার দর্শন,
মেহার প্রদেশে, জিন বৃক্ষমূলে বসি,
পৌত্র রূপে আসিবে যখন।"
শুনি ভক্ত দৈববাণী, উৎফুল্ল অন্তরে,
পূর্ব্বস্থলী করি পরিহার,

অবিলম্বে উপনীত মেহারে আসিয়া,
সহ নিজ পুত্র পরিবার।
দাসরাজা উপাধি তথায় জমীদার,
যত্ন করি দিল বাসস্থান,
শিষ্যত্ব গ্রহণ করি, যোগ্য গুরু জ্ঞানে,
বহুরূপে করিল সম্মান।
গেল ভক্ত কামাখ্যায়, মন্ত্রসিদ্ধি তরে,
—সাধনার সর্ব্বোপরি স্থানে।
সেখানেও পরাবিদ্যা সন্তুষ্টা হইয়া,
আশ্বাসিল স্বপ্নাদেশ দানে।
"মেহারের জিনবৃক্ষ সন্নিকটে আছে,
ভূগর্ভে প্রোথিত শিবলিঙ্গ,—
অর্চ্চি যাহা পূর্ব্বকালে সিদ্ধি লাভ করে;
মহামুনি তপস্বী মাতঙ্গ।
তদুপরি শবাসনে করি আরোহণ,
জপি ব্রহ্ম মন্ত্র হে সুজন,
যেমন ডাকিবে, তোমা দিব দরশন,
—পৌত্র রূপে আসিবে যখন॥"
পরাবিদ্যাদেশে তুষ্ট ভক্ত বাসুদেব,
মেহারে আসিল পুনর্ব্বার;
পূর্ণানন্দ নামে ভৃত্য জাতিতে চণ্ডাল,
সাধনার সঙ্গী ছিল তার।
কহিল সকল বার্ত্তা তাহার নিকটে,
—কহিল রাখিতে সংগোপনে—
পুত্র তার শম্ভুনাথ, তার পুত্র হ'য়ে,—
শীঘ্র পুনঃ আসিবে ভুবনে।

এত কহি যোগবলে ত্যজিল জীবন,
পৌত্র রূপে জনমিল আসি ;
সর্ব্বানন্দ নাম হ'ল, পূর্ণানন্দ কোলে
পূর্ণানন্দে রাখে দিবানিশি।
পূর্ণানন্দে সর্ব্বানন্দ ডাকে দাদা বলি,
দিবারাত্রি রহে তার সঙ্গে ;
পূর্ণদাদা ভিন্ন কারো বাক্যে কর্ণপাত,
করেনা সে কোনও প্রসঙ্গে।
পুত্র শিক্ষাতরে শম্ভুনাথ সাধ্যমত,
চেষ্টা যত্ন যা কিছু করিল,
সমস্ত হইল মিথ্যা, পুত্র দিন দিন
গণ্ডমূর্খ হইয়া উঠিল।
অধর্ম্ম, অকর্ম্ম, আর যত নীচ কর্ম্ম,
কিছুতেই তার শঙ্কা নাই।
ব্রাহ্মণের কুলে জন্মি সদা ভ্রষ্টাচার,
বেড়ায় যা পায় তাই খাই।
সমাজের সর্ব্বজনে নিন্দে সর্ব্বানন্দে,
দূর দূর বলে বলি মন্দ ;
পুত্র পরিণাম চিন্তি পিতা দুশ্চিন্তায় ;
—নিশ্চিন্ত একেলা পূর্ণানন্দ।
রাজগুরু পুত্র বলি বিবাহ হইল,
ঘটকের ঘটকালি জোরে ;
বিবাহান্তে জামাতার গুণ নিরখিয়া,
শ্বশুর শ্বাশুড়ী কান্দি ফিরে।
বিবাহ করিলে সর্ব্বানন্দ সর্ব্ব দিকে,
বিস্ময়ের প্রবাহ বহিল ;

অসাধ্য হইল সাধ্য ;—বর্ষত্রয় মধ্যে,
শিবনাথ পুত্র জনমিল।
শিবনাথ অতি অল্পে হইল বিদ্বান ;
তার যশে পরিপূর্ণ দেশ।
কিন্তু নিরক্ষর জ্ঞানশূন্য তার পিতা,
তাই সদা তার মনে ক্লেশ।
একমাত্র পূর্ণানন্দ এ ধরণীতলে,
সর্ব্বানন্দে করে সমর্থন ;
বাসুদেব সঙ্গী পূর্ণানন্দ, তাই বলি,
কেহ তাকে না করে লঙ্ঘন।
পূর্ণানন্দ ভয়ে সর্ব্বানন্দের উৎপাত,
অনেকে নীরবে সহ্য করে।
সহিলেও যখন অসহ্য বড় হয়,
নীরবে প্রহারে কলেবরে॥
একদিন সর্ব্বানন্দ পূর্ণানন্দ সঙ্গে
রাজসভা মধ্যে উপস্থিত।
সভাস্থ শ্রীশিবনাথ, জ্যেষ্ঠতাত সঙ্গে,
সর্ব্বানন্দে দেখিয়া স্তম্ভিত।
কি বলিতে কি বলিবে ভাবি দুই জন,
চিন্তাঘোরে উদ্বেগে রহিল ;
গুরু জ্ঞানে রাজা বহু করিয়া সম্মান,
উচ্চাসনে যত্নে বসাইল'।
কথার প্রসঙ্গে রাজা জিজ্ঞাসে সভায়,
"কোন্ তিথি আজ ?" সর্ব্বানন্দ
সকলের অগ্রে কহে, "আজি ত পূর্ণিমা ?"
—অগ্রে ভাষে মূর্খের আনন্দ।

ছিল অমাবস্যা তিথি, কহিল পূর্ণিমা,
উপহাসে পণ্ডিত যাঁহারা।
লজ্জা ক্ষোভে নতশির পুত্র শিবনাথ,
হতমানে প্রায় জ্ঞানহারা।
কহে রাজা শিবনাথে, গম্ভীর বচনে,
"অদ্য হ'তে সভা মধ্যে আর
আসিতে না দিও সবে এমন পণ্ডিতে
অমাবস্যা পূর্ণিমা যাহার।"
পূর্ণানন্দ সঙ্গে সর্ব্বানন্দ গেল উঠি,
শিবনাথ আসিল ভবনে ;
কহিল পিতার কার্য্য সজল নয়নে,
ডাকিয়া বাড়ীর সর্ব্বজনে।
পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী পুত্র সবে মিলি,
সর্ব্বানন্দে করে তিরস্কার।
কেহ যায় ঘাড় ধরি খেদাড়িয়া দিতে,
কেহ যায় করিতে প্রহার।
মর্ম্ম দুখে সর্ব্বানন্দ হইল বাহির,
পূর্ণানন্দ সঙ্গে সঙ্গে চলে।
পথে আসি সর্ব্বানন্দ পূর্ণকে জিজ্ঞাসে,
"কি নিমিত্ত সবে মন্দ বলে!"
পূর্ণানন্দ কহে, "আজ পূর্ণ অমাবস্যা,
তুই তাহা পূর্ণিমা কহিলি ;
রাজসভা মধ্যে উঠি লাভ এই হ'ল,
সকলের মুখ হাসাইলি।"
সর্ব্বানন্দ কহে, "আমি তাহার কি জানি,
পূর্ণিমা কি অমাবস্যা কবে।

যা মুখে আসিল তাই দিয়াছি বলিয়া,
　　কার্য্যে যা হওয়ার তাই হবে।"
পূর্ণানন্দ কহে, "তোর তুল্য মূর্খ নাই,
　　তোকে তাহা বুঝাব কি দিয়া।
মূর্খের মূর্খত্ব রাজসভায় কি খাটে,
　　তাই তোকে দিল খেদাড়িয়া॥"
সর্ব্বানন্দ জিজ্ঞাসিল, "বল্ তবে কিসে,
　　দূরে যাবে মূর্খত্ব আমার?
কিসে তিথি নক্ষত্রের তত্ত্ব জানা যায়?
　　—তত্ত্ব অমাবস্যা পূর্ণিমার?"
পূর্ণানন্দ কহে, "তত্ত্ব আছে পঞ্জিকায়
　　পড়িলেই সব জানা যায়।"
সর্ব্বানন্দ কহে, "কিন্তু পঞ্জিকা খুলিয়া
　　তা সকল পড়াই ত দায়?"
পূর্ণানন্দ কহে, "মূর্খ বুঝান কি দায়?
　　অগ্রে তুই লেখা পড়া শেখ্?
—তালপত্র আনি, ক, খ, এক, দুই, তিন্,
　　যত্ন করি আগে তুই লেখ্॥"
স্থূলবুদ্ধি সর্ব্বানন্দ এতক্ষণ পরে,
　　বুঝিল সকল তত্ত্বসার।
তিথি তত্ত্ব জানিতে যে তালপত্র লাগে,
　　কেহ তাকে কহে নাই আর।
লম্ফ মারি কহে, "তবে এখনি পাড়িব,
　　তালপত্র যত আছে গাছে,
কবে অমাবস্যা হয়, কবে বা পূর্ণিমা,
　　—আর যত পঞ্জিকায় আছে,—

শিখিয়া সকল তত্ত্ব ফিরে আমি যাব,
তোর সঙ্গে রাজার সভায়,
হোক্ অমাবস্যা, তাকে পূর্ণিমা করিয়া,
আমি সর্ব্বা দেখাব সভায়।"
এত বলি উঠে জগদ্ধাত্রী কৃপাপাত্র,
এক দীর্ঘ তাল বৃক্ষোপরে।
সেই বৃক্ষশিরে ছিল তীব্র বিষধর,
বিস্তারে সে ফণা রোষ ভরে।
ধরে সে সর্পের কণ্ঠ দৃঢ় মুষ্টি করি;
সর্প লেজে বান্ধে তার কর;
তখন সে উচ্চৈস্বরে কহে পূর্ণানন্দে,
"সর্পে বান্ধিয়াছে মোর কর্।"
পূর্ণানন্দ কহে, "যদি থর বাগুরায়
বিষধরে খণ্ড খণ্ড কর্॥"
সর্ব্বানন্দ বিষধরে খণ্ড খণ্ড করি,
নিক্ষেপিল ধরণী উপর।
ওই বৃক্ষ সন্নিকটে, বসিয়া তখন,
কোন এক মহা শক্তিমান
সাধক দেখিতেছিল কার্য্য দুজনার,
দেখি সে হইল সন্দিহান।
জিজ্ঞাসিয়া পূর্ণানন্দে, শুনি পরিচয়,
সাধকের অন্তরে বিস্ময়;
পূর্ণানন্দ সাধকের প্রসন্নতা হেরি,
"আসি" বলি অন্তরালে রয়।
সে সাধক সর্ব্বানন্দে যোগ্যপাত্র বুঝি,
ডাকিয়া কহিল উচ্চরোলে,

"হে বীর, নির্ভীকচিত্ত! কার্য্য নাহি আর
তালপত্রে, নাম ভূমিতলে ?
হেন মন্ত্র দিব তোমা, আজ রাত্রিকালে
জপ করি তার শক্তি বলে,
মুহূর্ত্তে হইবে সর্ববিদ্যা সুপণ্ডিত,
অদ্বিতীয় হইবে ভূতলে।"
শুনি সর্বানন্দ বৃক্ষ হ'তে নিম্নে আসি,
শ্রীগুরুর সম্মুখে বসিল।
পূর্ণ জ্ঞানময় গুরু সাধনা কৌশল
ধীরে ধীরে তায় শিক্ষা দিল।
ব্রহ্মমন্ত্র দিয়া বলে, "ভূগর্ভস্থ শিব—
—শিরোপরি কার শবাসন,
অর্দ্ধরাত্রি এই মন্ত্র জপে সিদ্ধ হবে,
হবে সর্ববিদ্যা মহাজন।
জিনবৃক্ষ সন্নিকটে আছে সেই স্থান
নিবিড় জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন।"
সন্ধান প্রদানি, মন্ত্র বক্ষোপরি লিখি,
অন্তর্হিত গুরু সুপ্রসন্ন।
ব্রহ্মবিদ্ কৃপাসিন্ধু তত্ত্বদর্শী গুরু,
দিল যবে ব্রহ্মমন্ত্র কর্ণে,
বহ্নি প্রবেশিল যেন লৌহে বা অঙ্গারে,
হ'ল তনু উজ্জ্বল সু বর্ণে।
উদ্ভাসিয়া উঠিল সহসা জ্ঞানেন্দ্রিয়,
দিব্যদৃষ্টি নয়নে প্রকাশ,
কর্ণদ্বয় ঝঙ্কারিত প্রণব ঝঙ্কারে,
চিত্তে পরানন্দের বিকাশ।

সম্পূর্ণ নূতন ভাবে অন্বিত স্বভাব,
নূতনত্বে বচন লোচন
পরিপূর্ণ; সর্ব্বানন্দ রঙ্গমঞ্চে যেন
নব সাজে রঙ্গক নূতন।
তারপরে আসি পূর্ণ দাদার নিকটে,
বিস্তারিয়া কহিল সকল
দেখাইল শ্রীগুরু লিখিত ব্রহ্মমন্ত্র,
সমুজ্জ্বল যাহে বক্ষস্থল।
পূর্ণানন্দ শুনি বার্ত্তা আনন্দে উন্মত্ত,
বাসুদেবে করিল স্মরণ,
পূর্ণ তাকে মৃদুবাক্যে সতর্ক করিয়া,
কহে বার্ত্তা রাখিতে গোপন।
সূর্য্যাস্ত সময় পূর্ব্বে পৌষান্ত দিবসে
অমাবস্যা তাহে শুক্রবার,
উভয়ে একত্রে চলে, যথা মাতঙ্গেশ,
জনশূন্য জঙ্গল মাঝার।
পূর্ণানন্দ সর্ব্বানন্দে উৎসাহিত করি
সাধনার করে আয়োজন;
—শিক্ষা দিল শবাসনে সাধনার ক্রম,
তত্ত্বদর্শী শিক্ষক মতন।
জিজ্ঞাসিল তার পরে, "ঘুমাইব আমি
ঠিক মৃত মানুষের মত।
করিব বিকট ভঙ্গি, দুঃস্বপ্ন দর্শনে,
বিভীষিকা দেখাইব কত।
আমি তোর পূর্ণদাদা, বৃদ্ধ, সুদুর্ব্বল,
তাহে হস্তপদ বদ্ধ রবে,

বক্ষোপরি র'বি তুই ; নিম্নে থাকি আমি
নড়িলে কি ভয় তোর হবে ?
আমি যদি চেষ্টা করি নিক্ষেপিতে তোরে,
মোর গণ্ড সবলে ধরিয়া,
ধৃষ্টতা বিনাশী মোর, বক্ষোপরি তুই
পারিবি কি থাকিতে বসিয়া ?
কত বিভীষিকা, আর কত প্রলোভন,
উঠাইতে আক্রমিবে তোরে,
অগ্রাহ্য করিয়া সব, এ মন্ত্র নির্ভয়ে
জপিতে কি পারিবি অন্তরে ?"
সর্ব্বানন্দ কহে, "দাদা জিজ্ঞাসিলি যাহা,
অতি তুচ্ছ কথা সে সকল ;
সচ্ছন্দে জপিব মন্ত্র একাগ্র অন্তরে,
অচঞ্চল রব হিমাচল।
বৃদ্ধকালে তুই যদি জিনিবি আমাকে,
ধিক্ মোর বাহুবলে তবে ;
শঙ্কিত করিবে, হেন জন্তু ভয়ঙ্কর,
সৃষ্টি মধ্যে কভু না সম্ভবে।
তোর বক্ষে বসি ভয় ? পর্ব্বত কন্দরে
বসি কে ডরায় প্রভঞ্জনে ?
শঙ্করের কোলে বসি শঙ্কিত কে কোথা,
নিরখিয়া ভূতের নর্ত্তনে ?
পুনঃ কহি শিবতুল্য শ্রীগুরু-কৃপায়,
লভিয়াছি জ্ঞানের আভাস,
সিদ্ধি-তরে চিত্ত মোর উদ্বিগ্ন এখন ;
—বৃথা তোর এ সব আশ্বাস।"

পুনঃ কহে পূর্ণানন্দ, "জপে তুষ্টা হয়ে,
ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি ধরি
সম্মুখে দাঁড়াবে আসি যবে ব্রহ্মময়ী,
বরদানে করোদ্যত করি,
তখন বলিবি, "অগ্রে ভৃত্যকে জাগাও,
সে যা প্রার্থে প্রার্থী আমি তাই
তাহার প্রার্থনা ভিন্ন শুন শুভঙ্করি
আমার প্রার্থনা অন্য নাই।"
কহে সর্ব্বানন্দ, "তাহা অবশ্য করিব,
তুই ভিন্ন বন্ধু কে আমার ?
তু মোর সর্ব্বস্ব দাদা, সঙ্গী এ জীবনে,
তোর যা প্রার্থনা তা আমার।"
শুনি যোগী পূর্ণানন্দ, যোগাবলম্বনে,
কলেবর করে পরিহার.
সর্ব্বানন্দ শিরোপরি শবাসন পাতি,
জপে ব্রহ্মমন্ত্র—মন্ত্রসার।
তৃতীয় প্রহরে দশ দিক উদ্ভাসিয়া,
জ্যোতির্ম্ময়ী হর-মনোরমা,
সর্ব্বানন্দ হৃদপদ্মালয়ে সমুদিয়া,
প্রকাশিল জ্যোতি অনুপমা।
কি আশ্চর্য্য মূর্ত্তি মার সাধক-বৎসলা,
ঈষদ্ধাস্য যুক্তা মুক্তিদাত্রী,
ভক্তাভীষ্ট প্রদায়িনী ত্রিলোকমঙ্গলা
ত্রিভুবন ব্যাপ্তা জগদ্ধাত্রী।
পদ্মাননা, পদ্মহস্তা, কোটী চন্দ্র জিনি
সুশীতলা, ভুবনমোহিনী

মণিরত্ন-খচিত-কর্ণিক-আভরণা
নিত্য বরাভয় প্রদায়িনী।
ফুল্ল-জবাকুসুম-সঙ্কাশ প্রভাময়া,
নেত্রে চন্দ্র সূর্য্য তারা জ্বলে,
ব্রহ্মময়ী কালীরূপ হেরি সর্ব্বানন্দ,
ভাবোন্মত্ত ভাসি চক্ষুজলে?
নিরক্ষর বদনে পাণ্ডিত্যপূর্ণ স্তব,
ললিত প্রবন্ধে বহির্গত।
ব্রহ্মপুত্র নদ, যেন প্রস্তরাবরণ
ভাঙ্গি সিন্ধুপানে প্রধাবিত।১

১। ব্রহ্মপুত্র নদ—ব্রহ্মার পুত্র ব্রহ্মপুত্র শিবার্চ্চনা করিতেছিলেন। পুষ্প না দেখিয়া, না ধৌত করিয়া, শিবের মাথায় অঞ্জলি দেন। সেই পুষ্পে বজ্রকীট ছিল। সে শিবের মস্তকে দংশন করে, শিব বিরক্ত হইয়া ব্রহ্মপুত্রকে ভূতলে সলিলরূপে অবস্থিত থাকিতে শাপ দেন। ব্রহ্মপুত্র শিবের স্তুতি মিনতি করেন। শিব প্রসন্ন হন এবং পরশুরাম কর্তৃক মুক্তিলাভ করিবেন, বলিয়া অন্তর্হিত হন। কালক্রমে পরশুরাম মাতৃহত্যা করেন, হাতে কুঠার আবদ্ধ হয়; হাতের কুঠার খসাইতে দ্বাদশ মহাতীর্থ পর্য্যটন করেন, কিন্তু কুঠার খসে না। পরশুরাম শেষে ঘোর চণ্ডাল মূর্ত্তি হন। দিনে জঙ্গলে থাকেন, রাত্রে ব্রাহ্মণগণের গোশালায় থাকেন। একদিন এক গোশালায় টঙ্গের উপরে আছেন। এমন সময় এক গাভী ও বৃষ বলাবলি করিতে থাকে। গাভী বৃষের জননী। গাভী বলে—"নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ তোর সাথে আমাকে জুড়িয়া লাঙ্গল টানায়। তুই বলবান, আমি বৃদ্ধা—তোর সাথে আমি সমান চলিতে পারি না বলিয়া আমাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করে, আর তুই তাহা সহ্য করিস্?" বৃষ বলে—"কত পাপের ফলে গরু হইয়া এই নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণের লাঙ্গল টানিতেছি—আবার ব্রহ্মহত্যা করিলে কোন নরকে গমন করিব, তাই ভাবিয়া কিছু বলি না। না হইলে তোমাকে যখন মারে, তখনই উহাকে বধ করিতে পারি।" গাভী বলিল—"ও ত চণ্ডাল। উহার বধে তোর ভয় কি? হিমালয়ের পাদদেশে

তথা শ্রীশ্রীসর্ব্বানন্দ কৃত স্তোত্র—

যা ভূতান্ বিনিপাত্য মোহজলধৌ

সংনর্ত্তয়ন্তী স্বয়ং।

যন্মায়াপরিমোহিতা হরিহর—

—ব্রহ্মাদয়ো জ্ঞানিনঃ॥

যস্যা ঈষদনুগ্রহাৎ করগতং

যদ্যোগিগম্যং ফলং।

তুচ্ছং যৎপদ সেবিনাং হরিহর—

—ব্রহ্মত্বং তস্যৈ নমঃ॥ ১

বেদা ন যৎপারমুপৈতি মাত—

—নৈবাগমো ন প্রমথাধিপশ্চ।

কস্মান্নরঃ ক্ষীণমতি স্তবাম্ব

তদ্রূপ সম্ভাবন তৎপরঃ স্যাম্॥ ২

ব্রহ্মপুত্র শাপগ্রস্ত হইয়া শিলাতলে অবস্থান করিতেছে। সেই শিলার আবরণ উঠাইয়া সেই ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিলে মাতৃহত্যাকারী পরশুরাম পর্য্যন্ত মুক্তিলাভ করিবে, আর তুই অমুক্ত থাকিবি!" বৃষ তখন আশ্বস্ত হইল; প্রভাতে ব্রাহ্মণ গোশালায় যেমন প্রবেশ করিল, অমনি তাঁহাকে হত্যা করিল,—এবং জননীর উপদেশ মত ব্রহ্মকুণ্ডের উদ্দেশ্যে হিমালয় প্রদেশে গমন করিল। পরশুরাম তাহার সঙ্গে চলিলেন। যথাস্থানে আসিয়া পরশুরাম হস্তস্থিত কুঠার দ্বারা এবং বৃষ নিজ শৃঙ্গদ্বারা শিলার আবরণ উন্মোচন করিয়া দিলেন। ব্রহ্মপুত্র দিব্য দেহ ধারণ করিয়া ঊর্দ্ধলোকে গমন করিলেন। পরশুরাম ও বৃষ কুণ্ডে স্নান করিয়া মেঘমুক্ত চন্দ্রের মত পাপমুক্ত হইলেন। এদিকে পার্ব্বত্য জলধারা কুণ্ডে পতিত হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তি হইল। ব্রহ্মপুত্র নদ আবরণ মুক্ত হইয়া সমুদ্র পানে প্রবাহিত হইল।

১। পরিচ্ছদের প্রথমে দেখ।

২। হে মাতঃ! তোমার অন্ত বেদ পান না, আগম পান না, এবং সদাশিবও পান না। হে অম্ব! আমি ক্ষীণমতি নর হইয়া সেই তোমার রূপ কিরূপে ধ্যান বা দর্শন করিব?

যস্তেজসোমণ্ডল মধ্যে সংস্থা-

হরাদয়ো কোটী দিবাকরাভাঃ।

বিভাতি পূর্ণেন্দু সমীপ সংস্থা-

—স্তারা যথা ব্যোমতলেহপ্য জস্রাঃ ॥ ৩

যা জীব রূপা পরমাত্মরূপা

যা পুংস্বরূপা চ কলত্র রূপা।

যা কামমগ্না পরিভগ্নকামা,

তস্যৈ নমস্তুভ্যমনন্তমূর্ত্তি ॥ ৪

ত্বমেব বিষ্ণু শ্চতুরাননস্ত্বং

ত্বমেব সবব পবনস্ত্বমেব।

ত্বমেব সূর্য্য শশলাঞ্ছনস্ত্বং

ত্বমেব সৌরিস্ত্রিদশা ত্বমেব ॥ ৫

ত্বং ভূতলস্থাখিল যজ্ঞকর্ত্রী-

ত্বং নাকসংস্থাখিল যজ্ঞ ভোক্ত্রী।

ত্বমেব তুষ্টাখিল মুক্তিদাত্রী

ত্বমেব রুষ্টা ত্রিজগন্নিহন্ত্রী ॥ ৬ ইত্যাদি।

৩। পূর্ণচন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া অগণ্য নক্ষত্র আকাশে যেমন শোভা পায়, কোটী সূর্য্যপ্রভা শিবাদি ও সেইরূপ তোমার তেজমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী হইয়া শোভা পাইয়া থাকেন।

৪। তুমি জীবরূপা, পরমাত্মরূপা, পুরুষরূপা এবং স্ত্রীরূপা। তুমি নিষ্কামা হইয়াও কামময়ী, তোমাকে নমস্কার করি।

৫। হে মাতঃ! তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি শিব, তুমি পবন, তুমি সূর্য্য, তুমি যম, এবং তুমিই সমস্ত দেবতা।

৬। তুমি ভূতলস্থ সমস্ত যজ্ঞের কর্ত্রী এবং স্বর্গে বসিয়া সমস্ত যজ্ঞের ফলভোগকারিণী। তুমি তুষ্টা হইলে অখিল মুক্তি দান কর, এবং রুষ্টা হইলে ত্রিভুবন সংহার কর। (তোমাকে নমস্কার করি।)

স্তবে তুষ্টা ব্রহ্মময়ী কহে, "কি প্রার্থনা,
শীঘ্র বল, শূন্য মোর কাশী।
পুত্র তুমি গৌরবের, যা ইচ্ছা করিবে,
নিজ হস্তে সম্পাদিব আসি।"
সর্ব্বানন্দ মহানন্দে আত্মপাসরিয়া
আসন হইতে সমুত্থিত ;
মহাবিদ্যা দর্শনে হইল সর্ব্ববিদ্যা ;
—পরানন্দে কণ্ঠ বিজড়িত।
আবেগ সম্বরি ভক্ত, গদ গদ ভাষে,
কহে, "মা গো, তব ভক্ত জন,
ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণুত্ব, কিংবা শিবত্ব, যা বল,
তুচ্ছ জ্ঞান করে সর্ব্বক্ষণ।
জীবন্মুক্ত সে মানব, বিষ্ণুমায়া তার,
কেশ স্পর্শ না পারে করিতে ;
উন্নত গগনচন্দ্রে অম্বুদে আবরে,
কিন্তু কভু নারে পরশিতে ?
তব ভক্তে যে আনন্দে রহে রাত্রিদিন,
ব্রহ্মানন্দ অতি তুচ্ছ তায়,
ভক্ত্যমৃত পানে অমরত্ব প্রাপ্ত যে,
দুঃখমূল ভোগ্য সে কি চায় ?
যাঁর পদ স্বর্গাপবর্গদ, পুত্র তাঁর
পার্থিব প্রার্থিবে কি অভাবে ?
ত্রিলোকের একছত্র নৃপতিত্ব দিলে
পরিত্যাগ করে সে স্বভাবে।
বিশ্বের ঐশ্বর্য্য এক দিকে, অন্য দিকে,
তব কৃপা করি পরিমাণ,

দেখি সে ঐশ্বর্য্য রেণু ; তোমার করুণা
অভ্রভেদী পর্ব্বত সমান।
সুর নর গন্ধর্ব্বাদি সর্ব্বেন্দ্রিয় ভোগ
পরিহরি নির্জ্জন কাননে,
যেরূপ দর্শন জন্য সহে তপক্লেশ,
সমর্থ যে সে রূপ দর্শনে,
প্রার্থনা কি থাকে তার ? অমৃতবাহিনী,
জাহ্নবীর তটে বসি কার,
রহে কূপোদকে তৃষ্ণা ? কল্পতরুতলে,
বাসীর কি বাসনা রম্ভার ?
প্রার্থনীয় নাহি কিছু, তবু বর দানে
বাঞ্ছা যদি বরদে তোমার,
সঞ্চার চৈতন্য ওই প্রাণশূন্য দাসে,
কর পূর্ণ বাঞ্ছা যাহা তার।"
শুনিয়া চৈতন্যময়ী পূর্ণানন্দ শির,—
চরণ-কমলে পরশিয়া,
কহে, "বৎস যোগনিদ্রা কর পরিহার,
প্রার্থনীয় কহ প্রকাশিয়া।"
উত্থিত হইল পূর্ণ,—নিশান্তে যেমন,
উঠে লোকে নিদ্রা পরিহরি,—
একদৃষ্টে কিছুক্ষণ দর্শন করিল,
ত্রিলোকমোহিনী শুভঙ্করী॥
দু'নয়নে আনন্দাশ্রু, তিতি গণ্ডস্থল,
বহে শৈলবাহী নদ প্রায়
মা বলিতে রুদ্ধকণ্ঠ, তনু রোমাঞ্চিত,
পুলকে বিহ্বল মনঃকায়।

আত্মসংবরিয়া ভক্ত আরম্ভিল স্তব,
আনন্দে আপন ইচ্ছামত।
ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ের অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস
শ্রবণে যা সিঞ্চনে অমৃত।
তথা শ্রী শ্রীপূর্ণানন্দ কৃত স্তোত্র—
উদাচ্ছারদ পূর্ণচন্দ্র নখরে মঞ্জীর সংশিঞ্জিতে।
ব্রহ্মাদাঞ্জলি তর্পিতৈঃ সুকুসুমৈরাক্তেঽতি রক্তেপদে ॥১
যন্নেত্রালি মধুব্রতৈর্নিপতিতং তেনৈবসিদ্ধং বরং।
কিং নস্যাদ পরং বরং ত্রিনয়নি প্রার্থ্যং ত্বদীয়ে পদে ॥২
"শারদীয় পূর্ণচন্দ্র তুল্য নখ-শোভা
যে চরণকমলে উত্থিত,
সে চরণ দর্শনে যে অধিকারী হয়,
মহাভাগ্যবান্ সে নিশ্চিত।
মুনীন্দ্র, যোগীন্দ্র, ইন্দ্র, বরুণ, পবন,
যে চরণ অর্চ্চনে সতত,"
কহে পূর্ণ, "সে চরণ দর্শনে যে জন,
কি বর সে প্রার্থিবে মাতঃ!
নিতান্ত যদি মা বর দিবে অভাজনে,
ও পদে মা প্রার্থনা আমার
দশমহাবিদ্যা রূপ দেখাও স্বগুণে
সাধকে যা প্রার্থে জানিবার।"

১,২। মা, তোমার যে শ্রীচরণ রক্তাভ, যে শ্রীচরণ নূপুরশিঞ্জন বিশিষ্ট, যে শ্রীচরণ উদিত পূর্ণচন্দ্র সদৃশ নখরদ্বারা পরিশোভিত, এবং যে শ্রীচরণে ব্রহ্মাদি দেবগণ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া থাকেন, সেই শ্রীচরণ কমলে যে আমাদের নয়নরূপ মধুকর পতিত হইতে পারিয়াছে ইহাতে কি সিদ্ধিলাভ হয় নাই? অতএব হে ত্রিনয়নে! তোমার চরণে আর কি বর প্রার্থনা করিব!

শ্রীশ্রীদশমহাবিদ্যারূপ—

"কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী স্তথা।
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতা॥"

দশমহাবিদ্যা রূপ, অনুগ্রহ করি,—
—অনুগ্রহ স্বভাব তাঁহার,—
দেখাইল জগদ্ধাত্রী, আরম্ভিল দোঁহে
স্তব, যাহা ভক্তি সুধাধার।

শ্রীশ্রীসর্ব্বানন্দ—

অসুররক্ত গলিতবক্ত্র চলদলক্তরাগিণী।
ধরণীলিপ্ত কুটিলমুক্ত চিকুরনক্তকারিণী॥
কলিতখণ্ড বিকৃতচণ্ড দনুজমুণ্ডমালিনী।
বিগতবস্ত্র নিশিতশস্ত্র কুণপমস্তধারিণী॥৩

শ্রীশ্রীপূর্ণানন্দ—

সুরত কর্ম্ম বিদিতমর্ম্ম গিরীশশর্ম্মদায়িনী।
অখিলসভ্য মননলভ্য ভবনভব্যকারিণী॥
অমৃতবৃষ্টি ভুবিকরিষ্টি পরমসৃষ্টিদায়িনী।
প্রণতবিষ্ণু গিরীশজিষ্ণু ভবকরিষ্ণুতারিণী॥৪

৩। শ্রীশ্রীসর্ব্বানন্দ কালীরূপ দর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন—বদনে অসুর রক্ত বিগলিত; অলক্তরঞ্জিত চরণে গতি; কুটিল কেশপাশ ধরণী স্পর্শ করায় নিশান্ধকার বিস্তৃত; ছিন্নশির হওয়ায় বিকৃত দৈত্য চণ্ডাদির মুণ্ডমালায় পরিশোভিতা; দিগম্বরী; অসুর মস্তকে শাণিত খড়্গধারিণী।

৪। শ্রীশ্রীপূর্ণানন্দ বলিতে লাগিলেন—সুরত কর্ম্মের মর্ম্মবিদিতা; শিবানন্দ বিধায়িনী; অখিল জগতের প্রতিকুল মতিকামিনী; (মানুষ মমতাময়ী, মা তাহার প্রতিকূল।) ভুবনমঙ্গলদায়িনী; অমৃতবর্ষণে পৃথিবীর মঙ্গলকারিণী, সৃষ্টি দায়িনী; প্রণত হরিহর ইন্দ্রাদির তারিণী॥

শ্রীশ্রীসর্ব্বানন্দ—

নত শুভঙ্করী শবশিরোধরা
রিপুভয়ঙ্করী রণদিগম্বরা।
জলধরদ্যুতি সমরনাদিনী
মদবিমোহিতা দ্বিরদগামিনী ॥ ৫

শ্রীশ্রীপূর্ণানন্দ—

নিশিত-শায়কাসুর-বিদারিণী—
হিমগিরি-ধ্বজাচল-নিবাসিনী।
ভব-সরিত্তরী গিরীশকামিনী
চরণ-নূপুরধ্বনি বিনোদিনী॥ ৬

উভয়ের স্তোত্রে তুষ্টা ত্রিলোকতারিণী—
পুনঃ কহে, "কি প্রার্থনা কর,
কাশী শূন্য করি আমি আসিয়াছি হেথা
শর্ব্বরী প্রভাতা প্রায় হের।"
কহে পূর্ণানন্দ, "তুমি কল্পতরুরূপা,
শরণাগতের মহাবল,
বর দান কর যদি, ও পদ-কমলে
শুন মোর প্রার্থনা সকল।
"সর্ব্বানন্দ-বংশে আসি জন্মিবে যাহারা,
হয় যেন ভক্ত অচঞ্চল,
যে মন্ত্রে আহ্বানি তোমা আমরা কৃতার্থ,
করে যেন সে মন্ত্র সম্বল।

৫। শরণাগতমঙ্গলা; মৃতদানবের শিরপরিধানা; শত্রুগণের ত্রাসকারিণী; রণে দিগম্বরী; জলদবরবরণা; সমরে সিংহনাদকারিণী; কারণবারিপানে উন্মত্তা; করিণীর মত গমনশীলা।

৬। তীক্ষ্ণশরে অসুর-ঘাতিনী; হিমালয়ের শিখরবাসিনী; সংসারনদতারিণী; শিবরাণী; চরণের নূপুরশিঞ্জনে আনন্দদায়িনী॥

অমাবস্যা রাত্রি আজ, পূর্ণিমা বলিয়া,
সর্ব্বানন্দ হইয়াছে নিন্দ্য।
সে নিন্দা বিনাশী, তাকে কর সর্ব্ববিদ্যা,
—কর তাকে সর্ব্বজন বন্দ্য॥
কত কোটী চন্দ্রশোভা ও করনখরে,
করচন্দ্র উচ্চাকাশে ধর,
শরণাগত-গৌরব-গুরুত্ব-বর্দ্ধিনী!
চন্দ্রালোকে বিশ্ব পূর্ণ কর।
সর্ব্ববিদ্যা শিষ্য ভক্ত হবে ভবে যারা,
ধনবংশ লভুক তাহারা।
সর্ব্বানন্দ কৃত স্তবে আহ্বানে যে তোমা,
তার প্রতি হও কৃপাপরা।
সিদ্ধলোক শিরোমণি সর্ব্বানন্দ দেবে,
হিংসা নিন্দা করিবে যাহারা,
—যে হউক—শঙ্কর (ও) সহায় যদি হন,
ধনে বংশে ধ্বংস হবে তারা।"
প্রার্থনা শুনিয়া অন্নপূর্ণা কাশীশ্বরী,
কর-জ্যোতি প্রকাশে গগনে,
অকলঙ্ক চন্দ্র দেখি অমাবস্যাকাশে,
বিস্ময় ঘটিল সর্ব্বজনে।
ভাল কিংবা মন্দ হবে, বুঝিতে না পারি,
রাত্রে আর কেহ না ঘুমায়।
কোলাহলে পূর্ণ হ'ল মেহার প্রদেশ,
উলুধ্বনি রমণী জিহ্বায়।
প্রভাতে শুনিয়া বার্ত্তা চমৎকৃত দেশ,
দাসরাজা লজ্জানত-শির।

সসম্মানে সর্ব্বানন্দে সংবর্দ্ধনে সবে.
অাসি বেষ্টি বসে যত ধীর।
নিষ্কিঞ্চন মহীয়ান কালীগত প্রাণ,
অবধূত-শ্রেষ্ঠ সর্ব্বানন্দ,
স্বেচ্ছায় ভ্রমণশীল দর্শনে তাঁহার,
সর্ব্বজনে লভে মহানন্দ।
কিছু দিবসান্তে শীত নিবারণ জন্য,
বহুমূল্য রাঙ্কব বসন,
সর্ব্বানন্দ পদে রাজা সমর্পণ করে,
গুরুপদে অতি ভক্তি মন।
বেশ্যা এক পথে বসি কহে সর্ব্বানন্দে,
"তুমি দেব সাক্ষাৎ ঈশ্বর!
পীড়িতা অসহ্য শীতে আমি অনাথিনী,
বস্ত্রহীন মোর কলেবর।
যদি কৃপা করি মোরে, এ অসহ্য শীতে,
দেও কোন বস্ত্র পুরাতন,
রক্ষা পায় এ জীবন ;—দরিদ্রে করুণা,
নাহি হয় নিষ্ফল কখন।"
জননীপ্রতিমা-দুঃখে দুঃখী সর্ব্বানন্দ ;
বহুমূল্য রাঙ্কব বসন,
তুচ্ছ তৃণগুচ্ছ তুল্য গ্রাহ্য না করিয়া,
করিল তাহাকে সমর্পণ।
বেশ্যা-গাত্রে দেখি বস্ত্র সর্ব্বজনে কহে,
"বেশ্যাসক্ত হয়েছে নিশ্চয়,
না হ'লে কি হেন বহুমূল্য বস্ত্র দান
করে হেন অপাত্রী বেশ্যায়।

আত্মীয় সুহৃদে নিন্দে, নিন্দে সর্ব্বজনে,
অনুতপ্ত রাজা নিজান্তরে,
মায়ার এমনি ভ্রান্তি শুন সর্ব্বজন
মায়ান্ধ যাচিয়া দুঃখে মরে।
অমাবস্যা পরিণত করে পূর্ণিমায়
যে প্রতিভা, তাহা গেল ভুলি।
"বেশ্যাসক্ত সর্ব্বানন্দ" কহি মূর্খদল
দিবারাত্রি করে হুলাহুলি॥
একদিন ভাগিনেয় ষড়ানন্দ সনে,
উপনীত রাজ সভাতলে ;
উচ্চাসনে বসাইয়া বিনম্র বচনে,
সর্ব্বানন্দে জিজ্ঞাসে সকলে।
"কোথা সেই বস্ত্র প্রভো, রাজার প্রণামী ?"
সর্ব্বানন্দ হাসিয়া কহিল,
"আছে গৃহে।" ষড়ানন্দে আনিতে বলিলে,
সে তখনি আনিতে চলিল।
বেশ্যাগৃহে—যে বসন ছিল, চর দিয়া
রাজা তা গোপনে আনাইল,
সর্ব্বানন্দে অপ্রস্তুত করিতে সভায়,
সবে খুব আটিয়া বসিল।
ভাগিনেয় ষড়ানন্দ ভবনে যাইয়া
কহে, "মামি! শীঘ্র বস্ত্র দেও।"
গৃহান্তরে ছিল মামী ; হস্ত বাড়াইয়া,
তারিণী কহিল, "বস্ত্র লও।"
সেই হস্ত, যাহে অমাবস্যার আঁধার,
বিদূরিল শশাঙ্ক সমান।

ষড়ানন্দ দেখি হস্ত সর্ব্ববিদ্যা ভঙ্গ,
করে স্তব করিয়া সম্মান ।
বস্ত্র নিয়া ষড়ানন্দ আসিল সভায়,
দেখি সবে বিস্ময়ে ডুবিল ।
বেশ্যার বসন সঙ্গে তুলনা করিয়া,
পার্থক্য না ধরিতে পারিল ।
সর্ব্বানন্দ দেবের আত্মীয় জ্ঞাতিগণ,
রাজার সহিত যোগ দিয়া,
নিন্দিল তাঁহায় বহু,—যত মিথ্যা কথা,
উচ্চারিল নাচিয়া নাচিয়া ।
যত পাপ আছে বিশ্বে, মহত-মর্য্যাদা-
লঙ্ঘনের মত পাপ নাই ।
ভক্ত নিন্দা কালী কভু সহিতে না পারে,
দৃষ্টান্ত সর্ব্বদা তার পাই ।
পূর্ণানন্দ-প্রাপ্ত সেই অষ্টবর মধ্যে
এক বর নিন্দকের নাশ ।
বরের প্রত্যক্ষ ফল স্বকুল নাশনে,
প্রথমে হইল পরকাশ ।
কিন্তু সর্ব্বানন্দ দেব দয়ার সাগর,
দেখি চিন্তাকুল সমুদয় ।
কহিলেন "দ্বাবিংশতি স্তরে মোর নাশ,
—রাজবংশ পঞ্চদশে ক্ষয় ।"
সর্ব্বানন্দ-পত্নী দেবী বল্লভা শুনিয়া,
স্বামীর শরণাগতা হ'লে,
"মুক্ত হও" বলি তাঁকে করি আশীর্ব্বাদ,
দেন মন্ত্র পুত্র-কর্ণমূলে ।

দীক্ষামাত্র শিবনাথ হন সর্ব্ববিদ্যা,
—ব্রহ্মমন্ত্রে ব্রহ্ম জ্ঞানোদয়।
শিবজ্ঞানে সর্ব্বানন্দে করিলেন স্তুতি,
শুনিলে যা কর্ণ পূত হয়।
কুলনাথ সর্ব্বানন্দ পুত্রে বর দিয়া,
মেহার তেয়াগি বাহিরান ;
ষড়ানন্দ পূর্ণানন্দ যান সঙ্গে সঙ্গে,
পথে গ্রাম সেনহাটী পান।
শিবতুল্য সর্ব্বানন্দে দেখিয়া সে গ্রামে,
আনন্দের প্রবাহ ছুটিল,
কুলধর্ম্মমর্ম্মী এক সাধকাধ্যাপক,
নিজ কন্যা তাঁকে সমর্পিল।
তার গর্ভে যে সকল পুত্র জনমিল,
সর্ব্ববিদ্যা উপাধি তা সবে,
বিদ্যা বুদ্ধি সাধনায় তাঁরা সমুন্নত ;
সকলেই মত্ত মাতৃভাবে।
তারপরে আসিলেন বারাণসী ধামে,
বৈদিকেরা বিরোধী হইল।
সর্ব্বানন্দে ভণ্ড বলি তাড়াইয়া দিতে,
বহু দণ্ডী একত্রে মিলিল।
"মৎস্য-মাংস-ভোজী, হীন ব্যাধের সমান,"
বলি সর্ব্বানন্দে তিরস্কারে,
সর্ব্বানন্দ শিশুতুল্য গণ্য করি সবে,
আরম্ভেন কৌতুক বাজারে।
বাজারের মধ্যে ভোজ্য পেয় যাহা ছিল,
মাংস মদে হল পরিণত ?

হেরি অসম্ভব দৃশ্য অনুতপ্ত চিতে,
পলায় সন্ন্যাসী দণ্ডী যত।
বারাণসী ছাড়ি সবে ধায় নানা দিকে,
এক দণ্ডী মেহারে আসিল ;
রাজার সভায় উঠি, রাজার বদনে
সর্ব্বানন্দ-মহিমা শুনিল।
অন্নপূর্ণা কৃপাপাত্র সিদ্ধ সাধনায়,
শুনি দণ্ডী চলিল ফিরিয়া,
কাশী আসি ভাঙ্গিল সন্দেহ সকলের,
সর্ব্বানন্দে বহু সংবর্দ্ধিয়া।
সর্ব্বানন্দ সংবাদ শ্রবণে সর্ব্বজন,
উল্লাসে উচ্চারে "শিব শিব !"
বর্ব্বর ভুলুয়া বার্ত্তা শুনে না শুনিল ;
—অন্ধের সমান নিশি দিব ?

শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী

ষষ্ঠ দিন

তীয় পরিচ্ছেদ।

ত্বমেকা গুহ্যেশ্বরী প্রজ্ঞারূপা '
বিদ্যা সমস্তা সর্ব্বার্থসাধ্যা।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ গুরু কঃ ত্বদন্য
ত্বমেকা জগন্মঙ্গলা শিক্ষাদাত্রী ॥ ১

সর্ববিদ্যাস্বরূপিণি, গূঢ়তত্ত্বরূপে !
হও তুমি প্রসন্না যখন,
সর্বতন্ত্রে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অধিকারী
হয় কত মূর্খ অভাজন।
কত পঙ্গু লঙ্ঘে গিরি ; উড়ুপে আরোহি,
কত শক্তিহীন সিন্ধু তরে ;

১। মা, তুমি প্রজ্ঞারূপিণী গুহ্যেশ্বরী, তুমি সর্ব্বপ্রয়োজন-পূর্ণকারিণী অষ্টাদশ বিদ্যা ; তুমিই জ্ঞান এবং তুমিই জ্ঞেয়। তুমি ভিন্ন গুরু আর কে আছে ? তুমিই জগতের মঙ্গলকারিণী শিক্ষয়িত্রী। তোমাকে নমস্কার করি ?

কত অন্ধ দিব্য চক্ষু লভি, দিব্য লোকে,
দিব্যালোক দরশন্ করে;
বিদ্যা তুমি, বুদ্ধি তুমি, তুমি সিদ্ধিদাত্রী,
—তোমারই (ত) নাম সিদ্ধেশ্বরী।
এ বিপন্ন ভুলুয়ায় প্রসন্না মা হও,
নামের গৌরব রক্ষা করি ॥
জিজ্ঞাসেন শ্যামানন্দ, "সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ
কোন্ তীর্থ ?" উত্তরে সন্তান,
"গুরুপাদপদ্ম জানশ্রেষ্ঠ তীর্থ হয়,
নাহি যার উপমার স্থান।"
জিজ্ঞাসেন শিবানন্দ, "গুরু-পাদ-পদ্ম
শ্রেষ্ঠতম তীর্থ কি নিমিত্ত ?
তাই যদি, গুরু কেন শিষ্যকে বলেন,
"তীর্থ ভ্রমি স্থির কর চিত্ত ?"
উত্তরে সন্তান, "তীর্থ ভ্রমি দীর্ঘকাল,
যতটুকু হয় চিত্ত স্থির,
গুরু সঙ্গে রহি, তাহা অতি অল্পকালে,
লভ্য হয় ভক্ত বিশ্বাসীর ॥
শান্তির সন্ধান শুদ্ধ জ্ঞানময় গুরু,
মোর জন্য নির্দ্দেশেন যাহা,
লক্ষ লক্ষ বরষ—ভ্রমিয়া লক্ষ তীর্থ,
বহু শ্রমে লভ্য নহে তাহা ?
দেশ-কাল-পাত্র-তত্ত্ব-বিচারে সক্ষম,
কর্ম্মদক্ষ গুরু মহায়ান,
আমার কর্ত্তব্য এক দণ্ডে যা শিখান,
তাহা কোটী দর্শন সমান।

তীর্থ যাত্রা পরিশ্রমে কোন্ প্রয়োজন,
পাই যদি গুরুদেব সঙ্গ,
তাপত্রয় মুক্ত হব চক্ষুর নিমেষে ;
মোহ-স্বপ্ন দণ্ডে হবে ভঙ্গ।
দণ্ডে দূর হবে মোর আলস্য ঔদাস্য,
চিত্তে হবে উৎসাহ অপার,
দণ্ডে হবে চিত্তে শুদ্ধ জ্ঞানের উন্মেষ,
হবে ধ্বংস মোহ অহঙ্কার।
এক দণ্ডে পূর্ণ হবে বিশ্বাসে হৃদয়,
হব বিশ্বনাথে মতিমান ;
এক দণ্ডে অভিব্যক্তি হইবে ভক্তির,
ভক্ত্যানন্দে উদ্বেলিবে প্রাণ।
জ্ঞানময় ভগবান শিষ্যের সম্মুখে,
গুরুমূর্ত্তি ধরি বিদ্যমান :
হেন গুরুদেবার্চ্চনে রতি মতি যার,
এ সংসারে সেই ভাগ্যবান।
কি উদ্দেশ্যে তীর্থ যাত্রা, চিন্তা যদি করি,
সহজ সিদ্ধান্ত মনে আসে,
তীর্থে মহাপুরুষের দর্শন মিলিলে,
চিত্ত পূর্ণ হয় সুবিশ্বাসে।
ভক্ত সাধু পদরজে কত অতীর্থকে
তীর্থীকৃত করেন শ্রীহরি
তীর্থে গিয়া হেন ভক্ত সাধুর বচনে,,
চিত্তের সংশয় নাশ করি।"

তথা শ্রীশ্রীভাগবতে অক্রুর প্রতি শ্রীভগবান—

ভবদ্বিধা মহাভাগা তীর্থীভূতা স্বয়ং প্রভো।
তীর্থী কুর্ব্বন্ত্যতীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃতা ॥১

তীর্থের প্রধান লক্ষ্য, গুরু সন্নিধানে
যদি বিনা পরিশ্রমে পাই,
বৃথা পর্য্যটন-শ্রম সহ্য করিবারে,
কি নিমিত্ত তীর্থবাসে যাই ?
বলেন শ্রীশিবানন্দ, "হেন গুরু লাভ,
কি উপায়ে শিষ্যের সম্ভবে ?"
উত্তরে সন্তান, "শিষ্য ব্যাকুল যখন,
গুরু আসি আপনি মিলিবে।
গুরু শিষ্য এক সঙ্গে রবে কিছুকাল,
দোঁহে দেখি দোঁহ আচরণ,
বিচার করিবে যোগ্য কে কত কাহার,
যোগ্য হলে সম্বন্ধ স্থাপন।
তুচ্ছ বস্তু লাভ তরে কত পরিশ্রম,
কত অর্থ নাশ, মোরা করি।
সুদুর্লভ গুরু লাভে তাহার শতাংশ
স্বীকারিলে ভবসিন্ধু তরি !
নিত্য আশীর্ব্বাদক কে গুরুর সমান ?
গুরু তুল্য কে মঙ্গলালয় ?
সর্ব্বান্তঃকরণে গুরুভক্তি আছে যার,
সর্ব্বত্র তাহার ঘটে জয়।

১। শ্রীভগবান পরম ভাগবত অক্রুরকে বলিলেন,—আপনাদের ন্যায় মহাভাগ ভক্তগণই সাক্ষাৎ তীর্থ। ভগবান গদাধর আপনাদের ন্যায় ভক্তগণদ্বারা অতীর্থকে তীর্থে পরিণত করেন।

গুরু-বল বড় বল এ ধরণীতলে,
　　গুরু যার প্রতি অনুকূল,
সংসার-সঙ্কটে তার নিত্য মুক্তি ঘটে,—
　　ভবার্ণবে সেই পায় কূল।
ব্রহ্মময়ী কালী-পদে তার (ই) ভক্তি ঘটে ;—
　　কর্ত্তব্যে তাহার নাহি ভুল।
সংসারের মায়ামোহে উন্মত্ত হইয়া,
　　হারায় না সে কখনো মূল ?
বিবেক বৈরাগ্য লাভে তারই অধিকার,
　　সেই হয় সংযমী প্রধান,
উজ্জ্বল অনলযোগে ইন্ধন যেমন,
　　সেরূপ সে হয় দৃশ্যমান।
গুরু শিষ্যে বিবেক-বৈরাগ্য-ভক্তি-ভার,
　　আচারে প্রচারে অনুক্ষণ।
অশেষ কল্যাণ লভে সংসারের লোক,
　　নিত্য তাহা করি নিরীক্ষণ।"
ঢাকাবাসী বৈষ্ণব বাবাজী রামদাস
　　কহিলেন মৃদুহাস্য করি,
"গুরু যদি এতই মহিমাময় হন,
　　তবে কেন ব্যতিক্রম হেরি।
বহুস্থানে বহুজন গুরু লাভ করে,
　　তাহাদের বৈরাগ্য কোথায় ?
—ভোগের বৈরাগী, যোগে সম্পর্ক-বিহীন,
　　নানারূপ অনর্থ ঘটায়।
গুরু যার বিলাস ব্যসনে অনুরক্ত,
　　সে কি হয় রূপ, রঘুনাথ ?

বরং যে থাকে ভাল, গুরু লাভ করি,
ঘটায় সে অনর্থ উৎপাত।
গুরু করে সামাজিক শৃঙ্খলা ভঞ্জন,
শিষ্য পৃষ্ঠপোষণে তাহার,
কোনস্থানে গুরুসেবা কায়মনে করি,
শিষ্য হয় ভাগী লাঞ্ছনার।
শিষ্য দিয়া উদ্ভট বিভৎস কর্ম্ম করে,
এক সাক্ষী দেখ তার ঢাকা শ্রীনগরে।
গুরু শিষ্য ঘটাইয়া কল্কী-অবতার,
যে কাণ্ড করিল তাহা মুখে আনা ভার।
গুরু ঝুলে ফাঁসিকাষ্ঠে এক শিষ্য নিয়া;
শিষ্য ভোগে কারাবাস দ্বীপান্তরে গিয়া।১

১। ঢাকার অন্তর্গত শ্রীনগরে একজন ধর্মপ্রাণ এল্ এম্ এস্ ডাক্তার ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই সাধুসজ্জনের সেবাপরায়ণ ছিলেন; অনেক সাধু সন্ন্যাসী তাঁর নিকটে আসিতেন। একবার দুই শিষ্য সঙ্গে এক সাধু আসিল। সে মাটিকে চিনি বনাইতে লাগিল,—লোকের অতীত ভবিষ্যৎ বলিতে লাগিল। নানারূপ গন্ধ ছাড়িতে লাগিল। চন্দ্রে কোন গন্ধ নক্ষত্রের মধ্যে কোনটায় কোন গন্ধ তাহা দেখাইতে লাগিল। অনেক লোক তার ভেল্কীতে তার শিষ্য হইল। ডাক্তারবাবুও শিষ্য হইলেন। ডাক্তারবাবুর বাড়ীর অন্যান্য লোক তাহাতে দুঃখিত হইলেন। কিন্তু উপার্জ্জন করিয়া সংসার প্রতিপালন করেন—তিনি সকলের রক্ষক—তাই মনে মনে সাধুর প্রতি বিরক্ত হইলেও কেহ কোন কথা বলিত না। ক্রমে তিন বৎসর গত হইল। গুরু সঙ্গে গুরুকৃপায় ডাক্তারবাবু সাধনচক্রে চক্রী হইলেন। গাঁজা খাওয়া, কারণ করা অভ্যাস করিলেন। মাথা কিছু খারাপ হইল। গুরুর সঙ্গে যে দুই শিষ্য ছিল তার একজন চণ্ডাল একজন ব্রাহ্মণ। চণ্ডাল মহাবলবান, ব্রাহ্মণ কৃশকায় দুর্ব্বল। গুরু যাহা বলে ডাক্তারবাবুর তাহাতেই অটল বিশ্বাস। গুরু কল্কী-অবতার করিতে মনস্থ করিলে, ডাক্তারবাবু উপকরণ জোগাড়ে প্রবৃত্ত হইলেন। যজ্ঞ আরম্ভ হইল,

নদীয়া জেলার মধ্যে অন্য এক গুরু,
মাতাল হইয়া পাসরিয়া লঘু গুরু,
মাকে দিয়া শিশু-পুত্র কাটিয়া কুটিয়া—
রান্ধাইয়া খায় মাংস হরিবোল দিয়া;
সশিষ্য যাইল গুরু শেষে দ্বীপান্তরে,
সমস্ত সংবাদপত্র এ তত্ত্ব প্রচারে।
অন্য এক গুরু কাকিনাড়া একবার,
ষ্টেশনের মধ্যে করি বিস্তৃত পশার,

ডাক্তারবাবুর বাড়ী চারিদিকে প্রাচীর আঁটা। সেই বাড়ীর মধ্যে যজ্ঞস্থান হইল। পাঁচ টীন কেরোসিন, দুই টীন ঘি, এক গাড়ী খড়ী, বাড়ীর লেপ তোষক বালিশ। কাট সাজাইয়া, লেপ তোষক তার উপরে দিয়া, কেরোসিন তেল ঢালিয়া আগুন ধরান হইল। তার পরে গুরু চণ্ডাল শিষ্যকে বলিল, এই ব্রাহ্মণকে অগ্রে বৈকুণ্ঠে পাঠাও। চণ্ডাল ব্রাহ্মণ শিষ্যকে গলায় ছুরি মারিয়া খুন করিয়া আগুনের মধ্যে ফেলাইল। তখন ডাক্তারবাবুর ভ্রাতৃগণ পুলিশে খবর দিল, অন্যান্য পরিজনবর্গ স্ত্রীলোক বালকেরা পলাইতে লাগিল। ডাক্তারবাবুর স্ত্রীকে তখন ধরিয়া আনা হইল পাঁচ বৎসরের পুত্রকেও ধরিয়া আনা হইল। পুত্রকে কেরোসিন ভিজান কাপড়ে জড়াইয়া আগুনের মধ্যে আহুতি দেওয়ার উপক্রম করা হইলে পাড়ার লোকেরা ছিনাইয়া নিয়া রক্ষা করিল। কিন্তু চণ্ডালটা স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক শোয়াইয়া এক পা পাড়াইয়া ধরিয়া, আর এক পা হাতে ধরিয়া তাহাকে ফাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন স্ত্রীর আর্ত্তনাদে অগণ্য লোক বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। পুলিশও ইহার মধ্যে আসিয়া পড়িল। সব গ্রেপ্তার হইল। মোকদ্দমা হইল। গুরু ও চাঁড়ালের ফাঁসি হইল। ডাক্তার বাবুর স্ত্রী সাক্ষীতে বলেন "আমার স্বামীর কোন দোষ নাই। গাঁজা খাওয়াইয়া তাঁহাকে পাগল করিয়া এই সব কর্ম্ম করাইয়াছে। ডাক্তারবাবুর দশ বৎসর কারাবাসের হুকুম হয়। ঢাকা প্রকাশে এই ঘটনা প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহা মাত্র পাঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা।

ষ্টেশনের কর্ম্মচারী কোন ভদ্রজনে,
শিষ্য করি যায় আসে তাহার ভবনে,
সরল সুবুদ্ধি শিষ্য অতি ভক্তিমান,
গুরুকে করয়ে সেবা ঈশ্বর সমান।
গুরু কিন্তু পশুতুল্য অতি কামাতুর,
সংগোপনে করে কার্য্য ঘৃণিত পশুর,
শিষ্যের বিধবা ভ্রাতৃবধূকে লইয়া।
একদিন শিষ্যপত্নী স্বচক্ষে দেখিয়া,
অহিফেন সেবনে করিল প্রাণত্যাগ,
পলাইল গুরু সমাপিয়া মহা যাগ॥
গুরু হ'য়ে শিষ্যের গহনা করে চুরি,
শিষ্য তাহা পায় শেষে মোকদ্দমা করি॥
কত গুরু শিষ্যানীর টাকাকড়ি নিয়া,
করুণা দেখায় দিয়া কাশী তাড়াইয়া॥
বড় বড় গুরুর ঘটনা বড় বড়,
বৃটিশ আইনে লোক রহে জড় সড়।"
সন্তান কহিল ধীরে, "সত্য এ সকল।
(কিন্তু) নর্দ্দমার জল কভু নহে গঙ্গাজল।
দুর্জ্জন বসিলে পূজ্য গুরুর আসনে,
স্বভাবে কুকার্য্য করে সকলেই জানে।
রত্ন বিজড়িত হার মর্কট-গলায়,
পরাইলে ছিন্ন করি আনন্দ সে পায়।
মাংসপ্রিয় শার্দ্দূল রাজত্ব যদি পায়,
প্রজামাংস ভক্ষে সুখে প্রভাতে সন্ধ্যায়।
তার জন্য রাজধর্ম্ম নিন্দনীয় নহে,
রাজা ভিন্ন এ সংসারে কোথায় কে রহে।

বিবেক বৈরাগ্যহীন ভোগাসক্ত নর,
কৌশলে বিমুগ্ধ করি মূঢ়ের অন্তর,
গুরু হয়, করে পূর্ণ আপন বিলাস,
শিষ্যেরা যোগায় বসি গণ্ডারের ঘাস।
এ সকল সঙ্গে গুরু তুলনীয় নহে,
পুন্যময় গুরুলোক বহু উচ্চে রহে।
এখনও গুরুলোক বিস্তারি আলোক,
অন্ধকার করনে বিনাশ,
এখনও অন্ধ জনে পথ দেখাইয়া,
নিয়া যান শান্তির নিবাস।
এখনও আর্য্য লোক গুরুগণ জন্য
ভুলে নাই কর্ত্তব্য তাহার।
লক্ষ বিপ্লবের মধ্যে যোগ জ্ঞান ভক্তি,
রাখিয়াছে বক্ষে করি হার ?
এখনও গুরুবলে শ্রীবিবেকানন্দ
চিকাগোর ধর্ম্ম সম্মিলনে,
প্রকাশিয়া সনাতন ধর্ম্মের রহস্য
সম্মানিত সর্ব্বোচ্চ আসনে।
এখনও শ্রীত্রৈলঙ্গী, শ্রীভাস্করানন্দ,
শ্রীবিহারীলাল বঙ্গবাসী,

শ্রীত্রৈলঙ্গী—শ্রীশ্রীত্রৈলঙ্গ স্বামী, কাশীধামে থাকিতেন, সাড়ে তিন শত বৎসর বয়সী।

শ্রীভাস্করানন্দ—শ্রীশ্রীভাস্করানন্দ স্বামী, শীতে গ্রীষ্মে উলঙ্গ থাকিতেন। বেদান্তের অদ্বিতীয় পণ্ডিত। রুশিয়ার সম্রাট জার নিকোলাস ও মধ্যপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা মাক্‌ডোলাণ্ড সাহেব তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন।

শ্রীবিহারীলাল মুখোপাধ্যায়—শ্রীশ্রীত্রৈলঙ্গ স্বামীর মত শীত উষ্ণ সুখ দুঃখে সমজ্ঞান ছিলেন। বাড়ী ঢাকায়। দশাশ্বমেধ ঘাটে তাঁহার প্রতিকৃতি আছে।

গুরুবলে জীবন্মুক্ত হইয়া সকলে,
সমুজ্জ্বল করে বারাণসী ?
অতএব গুরুলোক নহে মেঘাচ্ছন্ন,
গুরুর মাহাত্ম্য নহে ক্ষীণ,
নিন্দনায় নহে গুরুভক্তি গুরুপূজা,
গুরুমন্ত্র নহে শক্তিহীন ॥
জ্ঞানময় তত্ত্বদর্শী গুরু আছে যার,
গুরুর মাহাত্ম্য সেই জানে।
গুরুর গৌরবে কত গৌরব তাহার,
অনুভূত নিত্য তার প্রাণে ॥
বরং তেয়াগি ধর্ম্মতত্ত্বানুশীলন,
তেয়াগিয়া সাধুগুরু সঙ্গ
তেয়াগিয়া সদাচার, তপস্যা, সংযম,
তেয়াগিয়া ভক্তির প্রসঙ্গ,
অবলম্বি বিজাতীয় ঘৃণ্য বিলাসিতা,
অবলম্বি জড়ত্বের ভাষ্য.
অবলম্বি অবিশ্বাস, আর অহঙ্কার,
দিন দিন মোরা পরিহাস্য ॥
ভারতের আর্য্য জাতি, যাহাদের ধর্ম্ম
সর্ব্বজীবে দয়া, অনুরাগ,
বিবেক-বৈরাগ্য আর ভক্তি ভগবানে,
আর তুচ্ছ বিলাসিতা ত্যাগ,
তারা আজি দেবত্ব করিয়া পরিহার,
পরবেশি রাক্ষসের দলে,
হইয়া ব্রাহ্মণ ঘাড়ে লইয়া বন্দুক,
পশু পক্ষী মারিবারে চলে ॥

রাক্ষসের মত করে ব্রাহ্মণে আহার,
ভাবে তাহা মহাপুরুষার্থ ;
বিলাসীর পরিচ্ছদ তপস্বীর প্রিয়,
জাতি এবে এত অপদার্থ ॥
সগৌরবে লজ্জা নাই, ঐক্য নাই মনে,
লক্ষ্য নাই সত্যাবলম্বনে,
সত্যানুসন্ধানে চিত্ত প্রধাবিত নয়,
শুদ্ধবুদ্ধি সম্ভবে কেমনে !!
শুদ্ধবুদ্ধি ভিন্ন ভক্তি ভগবানে কার,
শুদ্ধ ভাবে অন্তরে সম্ভবে !
শুদ্ধভক্তি না জন্মিলে সদ্‌গুরু নিমিত্ত
ব্যাকুল কে কোথা হয় কবে !!
করকোষ্ঠী কপাল গণিতে পারে যারা,
রোগের ঔষধ দিতে পারে ;
বন্ধ্যার সন্তান জন্য মাদুলী পরায়,
মূর্খ নরে গুরু করে তারে।
ধুলা তুলি হাতে দিয়া চিনি যে খাওয়ায়,
গন্ধ ছাড়ে ছুঁচোর মতন,
মোহান্ধ সমাজে উচ্চ গুরু তার নাম,
তার শিষ্য হয় বহুজন ॥
হেন গুরু ঘটাইলে অধর্ম্ম অন্যায়,
তাহা তস্কর স্বভাবের কর্ম্ম।
—পয়োধরে বসি জোঁক রক্ত চুষি খায়,
বস্ত্র কাটা মূষিকের ধর্ম্ম।
তার জন্য সাধু গুরু মনস্বী মণ্ডলে,
কি নিমিত্ত হবে অপবাদ,

গঞ্জিকা দোকানে রসগোল্লা না পাইয়া,
কার চিত্তে ঘটে অবসাদ !!
অন্বেষিয়া কর গুরু তত্ত্বদর্শী জনে,
অনর্থ যাহার চিত্তে নাই,
ভেদবুদ্ধি শূন্য, সদা বৈরাগ্যে আসীন,
গ্রাম্যালাপ নাহি যাঁর ঠাঁই।
ভক্তিতত্ত্ব শ্রবণ কীর্ত্তনে যে তন্ময়,
মাতৃভাবে চরিত্র নির্ম্মল,
হেন শুদ্ধ-বুদ্ধি জনে বরি গুরু পদে,
পান কর ভক্তি-পরিমল ॥
গুরু সঙ্গে কি নিমিত্ত রবে গ্রাম্যভাব,
স্বর্গের দেবতা তিনি হন।
সর্ব্বদা ভক্তির পাত্র, সর্ব্বদা নির্ম্মল,
পূত কর্ত্তা পরশ-রতন।
আত্মহিতকর তত্ত্ব—আলোচনা ভিন্ন,
তথা কেন রহিবে অন্যায়,
—সুধাভাণ্ডে রবে কেন ভেরাণ্ডার কষ,
রহিলে তা পানে কে কোথায় !!
গুরুপদে প্রার্থে যোগী যোগের কৌশল,
বিবেক বৈরাগ্য চাহে জ্ঞানী।
ভক্তেশ্চাহে ভাগবত-শ্রবণ-কীর্ত্তন,
ভোগৈশ্বর্য্য চাহে অভিমানী ॥
মোহান্ধ মানব চলে প্রবৃত্তির পথে,
করিতে ভোগের অন্বেষণ।
গুরু হয়, শিষ্য হয়,—উভয়ে সমান,
ইন্দ্রিয়ের ভৃত্য অনুক্ষণ।

নির্বিময়ী ভাগবত গুরুর নিকটে—
ইন্দ্রিয়ের ভৃত্য কেন যাবে,
যাইলেও মনে মহা সঙ্কট গণিয়া,
না বলিয়া গোপনে পলাবে ॥
তৃষ্ণা বিনা জলপানে আগ্রহ কে করে,
—চকোরেই চন্দ্রসুধা চায় !
যত্ন করি রাম নাম শুনাইলে, ভূত
ব্রহ্মদৈত্য তরাসে পলায় ।
শঠের সহিত ঘটে শঠের সম্বন্ধ,
দুর্ম্মতি পরিয়া গুরুসাজ,
শিখিয়া কৌশল আসি দুর্ম্মতি মণ্ডলে
হয় এক গুরু মহারাজ ॥
শিষ্য চাহে দারা পুত্র প্রভুত্ব ঐশ্বর্য্য,
গুরু চাহে কিছু কিছু অংশ ।
শিষ্য যদি সে দাবীতে আপত্তি উঠায়,—
গুরু উঠে করিতে নির্ব্বংশ ॥
বৈরাগ্যের মার্গে শান্তি বিরাজে যেমন,
আসক্তিতে কলহ তেমন ।
—কাড়াকাড়ি-মার্গে তথা লাঞ্ছনা দুর্ণাম,
নিবারিতে পারে কোন্ জন ?”
বলেন আভীরানন্দ, “শ্রবণ কীর্ত্তন,
পূর্ব্বে বলিয়াছ ভক্তি-সাধন-লক্ষণ ।
গোঁসাই বৈষ্ণব গুরু ভাগবত নিয়া,
শিষ্য গৃহে আসি কত যায় শুনাইয়া।
কিন্তু তাতে হয় কে বা রূপ রঘুনাথ ।
মনুষ্যত্ব লাভে কে বা করে দৃষ্টিপাত ?”

উত্তরে সন্তান, "যথা শ্রবণ কীর্ত্তন,
সাধনাকে অবলম্বি করে কোন জন,
শিষ্য তথা ভক্তিমার্গে হয় অগ্রসর,
তার সাক্ষী শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভক্তবর।
তাঁর উপদেশে, তাঁর শিষ্য বহু জন,
মনুষ্যত্ব লভি হত সাধক সজ্জন।
আর সাক্ষী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবে পাই,
শ্রীবিবেকানন্দ সৃষ্ট হ'ত যাঁর ঠাঁই।

"কিন্তু যথা হরিগুণ গানে লক্ষ্য টাকা,
শিষ্য ভাবে, টাকা মধ্যে হরিপদ ঢাকা।
গুরু আসি ভাগবত শিষ্যকে শুনায়,
রুক্মিণীর বিবাহের মালা বালা চায়।
শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষা শুনায় যখন,
শিষ্য ঠাঁই দাবী করে চা'ল চারি মণ।
আটা চায়, ডাঁটা চায়, ঘৃত চায় খাঁটী,
বামন ভিক্ষায় চায় জুতো, ছাতি, লাঠি।
বস্ত্রহরণের বস্ত্র যারা যত দিবে,
প্রভু কহে, "তারা তত ব্রজধামে যাবে।"
এইরূপ শ্রবণ কীর্ত্তন যথা হয়,
বৈরাগ্য কি ভক্তি তথা জন্মিবার নয়।

"আপন কল্যাণ চিন্তা চিত্তে নাহি যার,
শিষ্য জুটি কি কল্যাণ সাধিবে সে তার ?
সংসারী—বৈরাগ্য যবে বুঝাইতে বসে,
কহে কথা সংসারের সহিত আপোষে।
কথায় বৈরাগ্য, মনে ভাবনা সংসার,
—যাহা খায় উঠিবে ত তাহারি উদ্গার।

"প্রচলিত-প্রথা-রক্ষা-হেতু শিষ্য হয়,
মন্ত্র কাণে নিয়া দেহ শুদ্ধ করি লয়।
শিষ্য দীক্ষা চায় মাত্র দেহশুদ্ধি-তরে,
দীক্ষা দিয়া গুরু কিছু উপার্জ্জন করে।
সাধনার নাম গন্ধ নাহি কারো কাছে,
অতএব তার মধ্যে আলোচ্য কি আছে?"
কহে বৃদ্ধ রত্নগিরি, "যাহা শুনিলাম,
তাহাতে দীক্ষার মূল্য নাহি, বুঝিলাম।
নির্বিষয়ী গুরু নিত্য কোথায় মিলিবে—
বিষয়ান্ধ নরে চক্ষুদান কে করিবে?
নির্বিষয়ী সন্ন্যাসীর নিকটে যাইয়া
দেখিয়াছি, প্রায় তারা দেয় তাড়াইয়া।
তারা দেয় তাড়াইয়া, এরা টেক্স চায়,
বুঝিনা দীক্ষার্থী মোরা যাই বা কোথায়?"
উত্তরে সন্তান, "যাহা সত্য বুঝিতেছি,
—কালী যা বলায়—আমি তাই বলিতেছি।
বহু স্থানে কুলগুরু আছেন সজ্জন,
নির্বিষয়ী না হলেও মোহমুগ্ধ নন।
বহু শিষ্য তাঁহাদের উপদেশ নিয়া,
সাধনার পথে যান আনন্দে চলিয়া।
দীক্ষার যথেষ্ট মূল্য সে সকলে আছে।
সে সকলে বিড়ম্বনা কোথা ঘটিয়াছে।
কিন্তু যথা দীক্ষা মাত্র অর্থের সঙ্কেত,
গুরু মনে করে শিষ্যে বেগুনের ক্ষেত,
নাহি তথা মনুষ্যত্ব লাভে সম্ভাবনা।
বিবেক বৈরাগ্য ভক্তি তথায় ঘটে না।"

হেনকালে এক ভক্ত, নাম কালীপদ
ভট্টাচার্য্য—কালী নাম যাহার সম্পদ।
পুরুষানুক্রমে তারা করে গুরুগিরি,
উঠি দাঁড়াইয়া কিছু কহে ধীরি ধীরি,
"শুনিলাম বহুক্ষণ গুরুশিষ্য কথা,
সব সত্য, আমি তার না বলি অন্যথা।
কিন্তু মোর মনে এক জাগিছে সংশয়
অবনতি কেবল গুরুর দোষে নয়।
কালধর্ম্ম, যুগধর্ম্ম—রোধে সাধ্য কার,
এ কাল কলির, কলি মহারাজা তার।
কলির অধর্ম্মে আর অন্যায় বিচারে,
সমগ্র পৃথিবী ঘোর তম অন্ধকারে।
সর্ব্বত্র মিথ্যার জয়; সর্ব্বত্র মানব,
আত্মশ্লাঘা দম্ভ দর্পে গর্ব্বিত দানব।
স্বার্থপর, পরহিংসাপ্রিয়, দয়াহীন,
গুণের সম্মান নাই, দুর্ব্বৃত্তে সুদিন;
কামিনীর মোহে অন্ধ, ঘোর কামাতুর,
কামার্থ সঞ্চয়ে অর্থ, অনর্থ প্রচুর।
এ যুগে সাত্ত্বিক হ'লে দুঃখে নাহি পার,
সর্ব্ব ঠাঁই সে কেবল ভাগী লাঞ্ছনার।
অর্থহীন হ'লে, ঘৃণ্য সর্ব্বত্র ঠাকুর!
অর্থবলে হয় পূজ্য হ'লেও কুকুর।
কলির রাজত্বে, আর কলির শিক্ষায়,
ভগবানে ভক্তিহীন মানুষ ধরায়।
পিতৃমাতৃ ভক্তি নাই; রমণী সমাজে
নাহি পাতিব্রত্য; নর কুলটায় সাজে।

কালের প্রভাব, ইহা কলির প্রভাব,
এ পাপে স্পর্শিত প্রায় সমস্ত স্বভাব।
মহীয়ান নিষ্কিঞ্চন সাধক যাঁহারা,
প্রায়ই দেখি লুক্কায়িত রহেন তাঁহারা।
তাঁহাদের হিতবাক্য শুনিতে কে চায়,
নিঃশব্দে নির্জ্জনে তাঁরা থাকেন ধরায়।
কেবল গুরুর ত্রুটী শুনিতে না চাই.
পুরুষানুক্রমে গুরু, শিষ্য নাহি পাই।
অধিকাংশ লোকে প্রায় মোহান্ধ মতন,
ভোজ্য পেয় অন্বেষণে ব্যস্ত অনুক্ষণ,
সত্য মিথ্যা ন্যায়ান্যায় না করি বিচার,
যাহাদের কার্য্য মাত্র অর্থ রোজগার,
হিতবাক্য বলিলেও গুরুর কথায়,
কর্ণপাত করে তারা সংসারে কোথায়?
　　"গুরু যদি বলে, "পরনিন্দা ছাড় আগে;"
শিষ্য বলে, "পরনিন্দা দেশহিতে লাগে।"
গুরু যদি বলে, "মিথ্যা আর বলিও না।"
শিষ্য বলে, "তুমি হেথা আর আসিও না।"
গুরু যদি বলে, "আর না লইও ঘুষ।"
শিষ্য বলে, "বেটা কি অভদ্র অমানুষ।"
গুরু যদি বলে, "শুন দুটো ধর্ম্ম কথা।"
শিষ্য বলে, "এবে মোর অবসর কোথা?"
গুরু যদি বলে, "চল গঙ্গাস্নানে যাই।"
শিষ্য বলে, "গিন্নীর শরীর ভাল নাই।"
গুরু যদি বলে, "কেন বেশ্যা বাড়ী যাও?"
শিষ্য বলে, "তোমার মন্তর ফিরে লও;"

গুরু যদি বলে, "ছাড় সিগারেট বিঁড়ি।"
শিষ্য বলে, "এ সকল সভ্যতার সিঁড়ি।"
গুরু যদি বলে "কর চরিত্র উত্তম।"
শিষ্য বলে, "কিসে তুমি দেখ মোরে কম ?"
গুরু যদি বলে, "শিষ্য ছাড় অহঙ্কার।"
শিষ্য বলে, "আমি শ্রীচৈতন্য অবতার।"
গুরু যদি বলে, "কর সংযত আহার।"
শিষ্য বলে, "অন্ন-কষ্ট ঘটেনি আমার।"
গুরু যদি বলে, "পিতৃমাতৃভক্তি কর।"
শিষ্য বলে, "তুমি অগ্রে বাইবেল পড়।"
গুরু যদি বলে, "একটু হও সদাচার।"
শিষ্য বলে, "তাতে দেশ না হবে উদ্ধার ?"

"উপযাচি হিতবাক্য করিলে গোচর,
বিষয়ান্ধ শিষ্যে করে এরূপ উত্তর।
তার পরে দারিদ্র্যে এ দেশ জর্জ্জরিত,
ঘরে ঘরে অন্ন বস্ত্র কষ্ট বিস্তারিত।
যাগ যজ্ঞ করিতে আগ্রহ আর নাই।
—যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম্ম অন্বেষি না পাই।
আত্মোন্নতি কিসে হবে, সর্ব্বত্র এখনে,
কার্পণ্য ব্যতীত কিছু না পড়ে নয়নে।
গুরুর কি দোষ, আর শিষ্যের কি দোষ,
মহামন্ত্র কর্ণে এবে কলির নির্ঘোষ ?"

বলেন আভীরানন্দ, "যাঁরা মহাজন,
সর্ব্বত্র সর্ব্বদা তাঁরা মঙ্গল কারণ।
মায়ামুগ্ধ জীবে তাঁরা শক্তি সঞ্চারিয়া,
পারেন ত নিতে পুণ্যপথে উঠাইয়া।

তাঁহাদের কৃপা ভিন্ন মনুষ্যত্ব আর,
সম্ভবে না দেশে, এই ধারণা আমার।”
উত্তরে সন্তান, “অতি দীর্ঘকাল রোগে
উত্থান রহিত, যদি কোন ব্যক্তি ভোগে।
মৃত্যু তার যত অনায়াসে লভ্য হয়,
রোগমুক্তি তার তত শীঘ্র লভ্য নয়।
এ আর্য্যসমাজ অতি দীর্ঘকাল হ'তে,
নানা ভাগে ছিন্ন ভিন্ন, চলে নানা মতে।
একমাত্র শক্তিপূজা ছিল যতদিন,
ততদিন ছিল এরা সর্ব্বত্র স্বাধীন।
তারপরে শক্তিপূজা জন্য শক্তিমান,
পূজিতে বসিয়া এরা হল শতখান।
শত শত ব্যক্তি বস্তু পূজা আরম্ভিল,
শত শত সম্প্রদায় তাতে উৎপাদিল।
শত শত মন্ত্র, শত শত হল শাস্ত্র,
—শাস্ত্র নহে আত্মনাশী শত শত অস্ত্র।
শত শত হল জাতি, শত শত দল,
—পরস্পরে হিংসা নিন্দা কলহ কেবল।
একদেশদর্শী হ'ল শত শত গুরু
ঈশ্বর হইল কত হাতী ঘোড়া গরু।
শতখণ্ডে ভাঙ্গিল পর্ব্বত হিমালয়,
—অভ্রভেদী শৃঙ্গ এবে পদতলে রয়।
“শক্তি পূজে, কিন্তু আর নাহি শক্তিমান
কলির কবলে চূর্ণ কালীর সন্তান।
ব্রহ্মবাদী গুরুর অভাব উপজিল,
পূজার পদ্ধতি সব উলটিয়া গেল।

বিদ্যাশক্তি পূজিতে ছাড়িয়া অধ্যয়ন
পূজিতে বসিল পুঁথি দোয়াত কলম।
ত্যজিয়া বাণিজ্য কৃষি নিয়া নাড়ু বড়ি,
লক্ষ্মীপূজা আরম্ভিল লোকে বাড়ী বাড়ী।
সত্য ছাড়ি পূজা করে সত্যনারায়ণে,
চিনি কলা দুধ গুলি খায় সর্ব্বজনে।
কোথা সত্যনারায়ণ, মোরা বা কোথায়,
—নারায়ণ কৃপা নাই মিথ্যার ধরায়।
কোথা কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান, মোরা বা কোথায়,
—কর্ম্ম ছাড়ি কল্পনায় কে বা সিদ্ধি পায়।
সম্প্রদায় মোহে বদ্ধ গুরু ঘরে ঘরে,
পরম সুখদ ব্রহ্মানন্দ কে বিতরে।
সর্ব্বত্র বিস্তৃতা শক্তি—দুগ্ধের মাখন,—
গুরু নাই শিখাইতে সাধন-মন্থন।

"নিষ্কিঞ্চন মহীয়ান মহাজন যাঁরা,
শিক্ষা দিলে, সেই শিক্ষা গ্রাহ্য করে কারা?
মিথ্যা সংস্কারে মিথ্যা আচারে অভ্যস্থ,
জন্মাবধি বৃথাকর্ম্মে অতিশয় ব্যস্ত,
তাহাদের অভ্যাসের প্রতিকূলে ডাকি,
সত্য বুঝাইলে বলে, "দিয়া গেল ফাকী।"
ভক্ত মহাজনে নাহি দিলে অধিকার,
ভ্রান্তি বিনাশিতে শক্তি কোথায় কাহার!
শক্তি সঞ্চারের কথা প্রায় সবে বলে,
কিন্তু শক্তিসঞ্চার কি খাটে সর্ব্বস্থলে?
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ করুণাবতার,
জগাই মাধাই দোঁহে করেন উদ্ধার,

তারা ছাড়া আরো কত জগা মাধা ছিল,
করুণার অবতারে তারা কে তরিল।
মূল কথা সুকৃতির জোর না থাকিলে,
সাধুসঙ্গ ঘটিলেও সুবুদ্ধি না মিলে।
যাহাদের থাকে পূর্ব্ব সুকৃতির বল,
প্রায়ই দেখি সাধুসঙ্গে তারা পায় ফল।
নানা সঙ্গদোষে তারা পঙ্ক মাখে গায়
রহে ভস্মে আচ্ছাদিত হুতাশন প্রায়,
সুসঙ্গ-বাতাসে ভস্ম দেয় উড়াইয়া,
দৃশ্যমান হয় অগ্নি স্বমূর্ত্তি ধরিয়া।"
কহে বৃদ্ধ রত্নগিরি, "যাঁরা মহাজন,
তাঁহারাও হন কিছু স্বভাবে কৃপণ।
দেখিয়াছি তাঁহাদের নিকটে যাইয়া,
একথা সেকথা বলি দেন তাড়াইয়া॥"
উত্তরে সন্তান, "যিনি মহামহীয়ান
কৃপণতা তাঁর চিত্তে নাহি পায় স্থান।
ধীশক্তি থাকিলে করে যোগ্যতা বিচার।
যে যেমন, বলেন তাহাকে সে প্রকার॥
"মন্ত্রের অযোগ্য দেখি মন্ত্র নাহি দিয়া,
কৃষকে বলেন, "খাও লাঙ্গল চষিয়া।"
"বৈরাগীকে" হাতী দিলে হবে মিছামিছি।১।
বৈষ্ণবী কিনিবে, হাতী পাঁচ সিকা বেচি,
দোকানীকে ভাগবত দান করা বৃথা,
মশল্লার টোল্লা বান্ধে ছিঁড়ি তার পাতা।

১। বৈরাগীকে—জনসমাজে যাহারা বৈরাগী বৈষ্ণবী নামে পরিচিত। ভিকারীর দল।

বিষয়ান্ধ কৃপণে শুনিয়া ব্রহ্মবাদ,
কভু নাহি ছাড়ে তার সুদের বিবাদ।
সেইজন্য যে পথে যে সর্ব্বদা আকৃষ্ট;
সে পথে ঘুরায়ে তাকে উঠানো উৎকৃষ্ট।
বিষয়ীকে বিষয়ের পথে হাটাইয়া
নিতে চান তিনি শুদ্ধ পথে উঠাইয়া।
তাই তিনি অগ্রে নাম মন্ত্র নাহি দেন,
মন্ত্র দিয়া নামে অপরাধ না কিনেন॥
"শ্রদ্ধাহীনে দেয় নাম, রটে অপরাধ,—
ইহাই ত নামের নবম অপরাধ॥
গুরুগিরি কারবার খুলিয়াছে যারা,
নামে অপরাধ চিন্তা নাহি করে তারা।
যথার্থ সাধক যিনি তিনি সাবধান,
কর্জ্জ করি অপরাধ নাহি নিতে চান॥"
বলেন মাধবদাস, "সাধনার দেশ,
যত বাধা বিঘ্নে পূর্ণ নাহি তার শেষ।
দেশ কাল পাত্র সদা সর্ব্বত্র বিচার্য্য,
বিচারিয়া চলে যারা তারাই আচার্য্য॥"
বলেন শ্রীশ্যামানন্দ, "গুরুদেব প্রতি,
শিষ্যের কর্ত্তব্য কিছু বল;
যে প্রকার গুরুভক্তি কর্ত্তব্য শিষ্যের;"
ধীরে ধীরে সন্তান কহিল,—
"অবন্তী নগরে গুরু নাম সন্দীপন,
শিষ্য তার উদ্দালক—ভারতে বর্ণন।
উদ্দালকে দিয়া গাভী চরাইতে ভার,
আরম্ভিল সন্দীপন পরীক্ষা তাহার।

একদিন সন্দীপন উদ্দালকে ডাকি,
জিজ্ঞাসিল, "তোমা বড় হৃষ্টপুষ্ট দেখি।
কি সামগ্রী খাও তুমি, কিবা কর পান ?
কার গৃহে যাও, তোমা কে কি করে দান ?"
শিষ্য বলে, "গাভীগণ দোহন করিয়া,
যবে দূর বনে যাই, গৃহে দুগ্ধ দিয়া,
বৎসগণ দুগ্ধ পান করার সময়,
লইলে দু এক ধারা ক্ষুধা শান্তি হয়।
এইরূপে দুই এক ধারা দোহি খাই।"
গুরু বলে, "সর্ব্বনাশ! দেখি আমি তাই,
বৎসগণ হইতেছে ক্রমে শীর্ণকায়,
ভাল শিষ্য! বৎস মারি দুগ্ধ দোহি খায়!
এমন নিষ্ঠুর কর্ম্ম আর না করিবে,
করিলে নিশ্চয় মোর নিগ্রহে পড়িবে!"
"পুনঃ কিছুদিন পরে শিষ্যকে জিজ্ঞাসে
এত পুষ্ট দেহ তুমি করিতেছ কিসে?
মোর আজ্ঞা লঙ্ঘি বুঝি দুগ্ধ দোহি খাও,
লঙ্ঘিতে আদেশ মোর ভয় নাহি পাও!"
উত্তরিল উদ্দালক—করি জোড় কর,
"ক্ষুধার্ত্ত হইলে যাই নগর ভিতর।
ভিক্ষা করি উদরের যন্ত্রণা জুড়াই।"
গুরু কহে, "হেন শিষ্য কভু দেখি নাই।
চিরকাল এ পদ্ধতি ধর্ম্মপথে রয়,
ভিক্ষালব্ধ সামগ্রী গুরুকে দিতে হয়।
তুমি শিষ্য কর কার্য্য তার বিপরীত,
ভাল শিষ্য জুটিয়াছে আমার সহিত।

আজ হ'তে, সারাদিন ভিক্ষায় যা পাবে,
সন্ধ্যাকালে ভক্তিভরে মোকে আনি দিবে।"
"যে আজ্ঞা" বলিয়া শিষ্য করিল গমন,
ভিক্ষা করি করে নিত্য গুরুকে অর্পণ।
ডাকিয়া জিজ্ঞাসে গুরু কিছুদিন পরে,
এবে কিসে আছ এত পুষ্ট কলেবরে ?"
শিষ্য কহে, "সারাদিন ভিক্ষা যাহা পাই।
সন্ধ্যায় ওপদে সব সমর্পিয়া যাই।
রাত্রিকালে ভিক্ষা করি গৃহস্থের দ্বারে,
এড়াই ক্ষুধার জ্বালা—আছি এ প্রকারে।"
শুনি গুরু সন্দীপন আরক্ত লোচন,
বলে, "বেটা করে নিত্য কৌশল সৃজন।
যে কার্য্য করিতে আমি নিত্য করি মানা,
সেই কার্য্য করে করি নূতন কল্পনা।
গুরু আমি, শিষ্য তুই, ধর্ম্মের বিচার,
ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যে তোর কোন অধিকার ?
দিবারাত্রি ভিক্ষা করি করিবি অর্পণ,
না পারিস্ যথা ইচ্ছা কর্ পলায়ন।"
পুনঃ কিছুদিন পরে শিষ্যে শুধাইল,
"কি গো বাপু! শরীর যে ফুলিয়া চলিল!
শিষ্য কহে, " প্রভো খাই গোমূত্র গোবর।"
গুরু কহে, "দেখ, বেটা কিরূপ তস্কর।
গোমূত্র অভাবে মোর না হয় পাচন,
ঘুটের অভাবে ঘরে না ঘটে রন্ধন।
পুনঃ যদি গোমূত্র গোবর তুই খাবি,
এক দণ্ড মোর ঘরে রহিতে নারিবি।"

শুনি শিষ্য ভয়ে দুঃখে হ'ল ম্রিয়মান,
ভাবিয়া না পায় কিসে বাঁচাইবে প্রাণ।
গাভী রক্ষা হেতু বনে করিল গমন,
অনাহারে তিন দিন করিল যাপন।
দুর্ব্বল হইল চিত্ত, শীর্ণ হ'ল কায়,
তবু গুরুভক্ত শিষ্য গোধন চরায়।
হইল অসহ্য ক্রমে ক্ষুধার বেদন,
শস্ত সম অর্কপত্র করিল ভক্ষণ।
অর্কপত্র ভক্ষণে নাশিল দৃষ্টি-শক্তি।
অন্ধ হ'ল তবু না টলিল গুরু-ভক্তি।
গোধন পশ্চাতে শেষে চলে অনুমানে,
মরে তবু গুরুসেবা ভিন্ন নাহি জানে।
শেষে পড়ি জলশূন্য কূপের ভিতর,
উঠিতে নারিল অবসন্ন কলেবর।
আঘাত-পীড়িত চিত্তে পড়িয়া রহিল,
সন্ধ্যাকালে ধেনুপাল আশ্রমে পশিল।

শিষ্যকে না দেখি গুরু উদ্বিগ্ন অন্তরে,
অন্বেষিতে প্রবেশিল অরণ্য প্রান্তরে।
"কোথা উদ্দালক!" বলি ডাকে উচ্চৈস্বরে,
শিষ্য বলে "আমি আছি কূপের ভিতরে।"
জিজ্ঞাসিল গুরু, "কূপে কিরূপে পড়িলে?"
কহে শিষ্য, "জ্বলি দুর্ব্বিসহ ক্ষুধানলে,
অজ্ঞান হইয়া অর্কপত্র খাইয়াছি;
তার ফলে অন্ধ হয়ে কূপে পড়িয়াছি।
পড়িয়াছি, তাহে মনে দুঃখ নাহি গণি,
আশ্রমে গিয়াছে ধেনুপাল যদি শুনি।"

নিরখি পরখি ভক্তি গুরু সন্দীপন,
সাবাসিয়া আনন্দে ঝরিল দুনয়ন।
করে ধরি তুলি শিষ্যে নিজ বক্ষে নিল,
নিজের তপস্যা দিয়া শক্তি সঞ্চারিল,
অশ্বিনীকুমারদ্বয়ে করিয়া স্মরণ,
অন্ধত্ব বিনাশি দিল প্রফুল্ল নয়ন।
জ্ঞানালোক দিয়া ঘুচাইল অন্ধকার,
ধন্য গুরুভক্তি, ধন্য গুরুকৃপা আর!
উতথ্য দ্বিতীয় শিষ্য, তাকে সন্দীপন,
ধরিতে ক্ষেত্রের জল করিল প্রেরণ।
ক্ষেত্রের সলিল যদি বাহিরিয়া যায়,
অনুর্বর রবে ক্ষেত্র শস্য না জন্মায়।
উতথ্য বান্ধিল আলি, বহু যত্ন করি,
যত বান্ধে তত ভাঙ্গি জল যায় সারি।
সলিল ধরিতে নারি পড়িয়া ফাঁফরে,
শয়ন করিল শিষ্য আলির উপরে।
হল দিন গত, ক্রমে আসিল রজনী,
শিষ্যে না দেখিয়া গুরু চলিল আপনি।
"কোথা বৎস উতথ্য!" বলিয়া ডাক ছাড়ে।
সলিলের নিম্ন হ'তে শিষ্য হাত নাড়ে।
শিষ্যের কর্ত্তব্যজ্ঞান হেরি সন্দীপন
আনন্দে ধরিয়া কর করে উত্তোলন।
আশীর্ব্বাদ করিল করিয়া আলিঙ্গন,
জ্ঞানের নয়ন দিল করি উন্মীলন।
সঞ্চারিয়া সর্ব্বশক্তি করিল বিদায়,
গুরুপদ ধূলি নিয়া শিষ্য গৃহে যায়।

গুরুভক্তি রহে যার কৃতার্থ সে জন,
গুরুমূর্ত্তি অর্চ্চি কত জন মহাজন।
গুরুমূর্ত্তি অর্চ্চনায় সিদ্ধি কি প্রকার,
গুরুভক্ত একলব্য এক সাক্ষী তার।
দ্রোণের নিকটে অস্ত্র-শিক্ষার্থী হইল,
ব্যাধ বলি গুরু তাকে তাড়াইয়া দিল।
তাড়িত হইয়া শিষ্য আসি ঘন বনে,
দ্রোণ মূর্ত্তি গড়ি পূজে এক ভক্তি মনে।
ভক্তের ঠাকুর হরি নিরখি সকল,
একলব্যে অর্চ্চিলেন মহা অস্ত্রবল।
অর্জ্জুন অপেক্ষা হ'ল শ্রেষ্ঠ অস্ত্রবিৎ
নিরখিয়া একলব্যে বিশ্ব চমকিত।
অতএব গুরুভক্তি স্থির রহে যার,
সর্ব্বদর্শী ভগবান দেন পুরস্কার।
গুরু চাই তত্ত্বদর্শী নির্ম্মল-চরিত্র—
শিষ্য চাই স্থির-লক্ষ্য ভক্তিময়-চিত্ত।
গুরু শিষ্যে অভিনয় অতি অনুপম,
দৃষ্টান্ত তাহার কণ্ব শিষ্য নরোত্তম। (১)

(১) কণ্ব শিষ্য নরোত্তম—পরিশিষ্ট দেখ।

অতএব উদ্দালক নরোত্তম মত
শিষ্য যদি হয়, গুরুবাক্যে অনুগত।
গুরুগত প্রাণ শিষ্য নির্ভয় ধরায়,
ভুলুয়া কহয়ে, "নাহি সন্দেহ তাহায়।"

শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী।

ষষ্ঠ দিন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নমস্তে ভক্তলোকেশি ভক্তবিঘ্নবিনাশিনি,
ভক্তসঙ্গপ্রিয়ে ভক্তচিদানন্দ-বিবর্দ্ধিনি,
ভক্তনিন্দকঘাতিনি ভক্তগৃহবিলাসিনি,
ভক্তাবতার স্বরূপা ভক্তিমূর্ত্তিস্বরূপিনি ॥

জয়কালী কালত্রাসবিনাশিনী ত্রিলোকেশ-তনু-বাসিনী।
ত্রিতাপে তাপিত, চিরবিষাদিত মানস-উল্লাসিনী ॥
মঙ্গলময়ী মঙ্গলবাসনা, মঙ্গলমূরতি মঙ্গল-আসনা,
মঙ্গলবসনা, মঙ্গলভূষণা, মঙ্গলহাসে হাসিনী ॥
দীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণা, রুগ্নভগ্নমগ্নে বিস্তৃত-করুণা।
অভয় দানিতে অবনীতে অবতীর্ণা শ্রীপরমেশানী ॥
মহিমা-মোহিত-অমরবৃন্দ, বন্দনে সদা পদারবিন্দ।
ভুলুয়া গৌরবে, শ্রীপদসৌরভে মেদিনী উন্মাদিনী ॥

(ঝিঁঝিট।)

সুধান শ্রীশ্যামানন্দ, "যারা প্রবর্ত্তক
তাহাদের ধর্ম্ম কি প্রথম ?"
উত্তরে সন্তান, "প্রবর্ত্তকের প্রথমে
বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই উত্তম।"
বলেন শ্রীপূর্ণানন্দ, "ভেদবুদ্ধিময়
কলহের ধর্ম্ম বর্ণাশ্রম !"
উত্তরে সন্তান, "ভেদবুদ্ধি হয় গত,
অবলম্বি সাধনার ক্রম।
প্রবর্ত্তক হয় ক্রমে সাধকে উন্নত,
সাধক অনেক তত্ত্ব জানি,
সংশয়-বিমুক্ত হন ; হন সত্যপর,
হন সুবিশ্বাসী দিব্যজ্ঞানী।"
বলেন শ্রীপূর্ণানন্দ, "সত্য সমর্থনে,
বর্ণাশ্রমে ঘটে ব্যতিক্রম।"
উত্তরে সন্তান, "ভক্ত সত্যারূঢ় হ'লে,
বর্ণাশ্রম করে অতিক্রম।"
সুধান শ্রীপূর্ণানন্দ, "বর্ণাশ্রম ছাড়ি,
কি তাহার সাধনার ক্রম ?"
উত্তরে সন্তান, "বিশ্ব-সম্বন্ধ ভুলিয়া,
বিশ্বনাথে তন্ময় তখন।
দেখে বিশ্বনাথ জলে স্থলে অন্তরীক্ষে,
মাত্র তিনি আত্মীয় তাহার ;
সম্পদে বিপদে, কিংবা জীবনে মরণে,
তিনি ভিন্ন নাহি গতি আর।
তখন তাঁহার প্রেমে তাঁর পাদপদ্ম,
বক্ষে ধরি উল্লাসে মগন।

তাঁর সঙ্গে করে ক্রীড়া কৌতুক ; তাঁহার
বৈপরীত্যে নিস্পন্দ-লোচন।
কি তাঁহার বৈপরীত্য !—কর্কশ কোমল
ভাব যুগপৎ কার্য্যরত ;
যত্নে সৃজি, অনুপম স্নেহে রক্ষি জীব,
নিজ হস্তে সংহারে সতত।
কিন্তু ভক্ত সঙ্গে নিত্য আনন্দ স্বরূপ,
ভক্তে তাহা করে আস্বাদন,
সাধক সন্ধান লভি, অনন্য অন্তরে,
সেই ভাব করে আলিঙ্গন।
ক্রমে ক্রমে সিদ্ধাবস্থা যখন সে পায়,
তখন সে হয় অপ্রাকৃত ;
কভু হাসে কভু কান্দে কভু নাচে গায়,
ভূতে ধরা মানুষের মত।
তখন তাহার হয় রমণী জননী,
পুত্র হয় পিতার মতন।
শত্রু হয় মিত্র, হয় পুরুষ প্রকৃতি,
কভু কান্তভাবে নিমগন।
মহাভাবে কভু মান করে সে তখন,
করে রাস রস আস্বাদন,
—কোথা বিশ্বনাথ, আর কোথা ক্ষুদ্র নর।
ঘটে নিত্য বিরহ মিলন।
তখন সে দিব্যোন্মাদ এই চরাচরে,
প্রকৃতিপুরুষ রাস ভিন্ন,
কিবা নেত্র মুদি, কিবা নেত্র উন্মীলিয়া,
অনুসন্ধি নাহি দেখে অন্য।

দেখে উচ্চাকাশে নৃত্য করে, সুধা পানে,
তারাগণ সহ তারাপতি।
সর্পিণী অধরামৃত পানে আত্মহারা,
নাচি ব্রহ্মরন্ধ্রে করে গতি।
বৈঠে নাদ চন্দ্র কোলে আমোদ বিহ্বলা,
—কান্ত কোলে কান্তা রসবতী।
গোকুলে কুলদায়িনী কুল ভাসাইয়া,
কৃষ্ণ কোলে নাচে রাধা সতী।
কুমারী কুমার সঙ্গে, যুবতী যুবকে,
বৃদ্ধা বৃদ্ধ সঙ্গে নৃত্য করে ;
লজ্জিতা লতিকা তরুকণ্ঠ জড়াইয়া,
নৃত্য করে আনন্দ অন্তরে।
বিশ্ব নাচে, নিঃস্ব নাচে, নাচে বিশ্বনাথ,
সে তখন নাচে সঙ্গে সঙ্গে ;
আছে জরা জন্ম-মৃত্যু-শূন্য পুণ্যালোক,
বিহরে সে তথা পুলকাঙ্গে।
জ্ঞানে ধ্যানে যার চিত্তে সে রস না জাগে,
বলিয়া বুঝান তাকে দায়,
পরমা প্রকৃতি কুলকুণ্ডলিনী সাধি,
সাধকে সে মহাভাব পায়।
ধর্ম্মাধর্ম্ম-কর্ম্মাকর্ম্ম বুদ্ধি সে সময়,
সাধকের অন্তর্হিত হয়,
নাহি থাকে আত্মপর, নাহি দুঃখ সুখ,
—লাভালাভ জয় পরাজয়।

তথা শ্রীরামপ্রসাদে—
"তেমন দিন কি হবে তারা ! তেমন দিন কি হবে তারা !
যে দিন তারা তারা তারা বলি, তারা বেয়ে পড়্‌বে ধারা।

হৃদপদ্ম উঠবে ফুটে, ভেদ বুদ্ধি যাবে ছুটে,
ভূমিতলে পড়্‌ব লুটে তারা বলি হব সারা ॥” ইত্যাদি।

“সে দিন শ্যামা মাকে পাবি।
যে দিন, ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, বিবেক খুঁটায় বেন্ধে থুবি।
প্রবোধ না মানে যদি, জ্ঞান খড়্‌গে বলি দিবি ॥” ইত্যাদি।

সুধান শ্রীপূর্ণানন্দ, “সেই মহাভাব,
আশ্রয়ে সমর্থ কোন্‌ রস ?
উত্তরে সন্তান, “রসশ্রেষ্ঠ আদিরসে,
ভাবুকের মহাভাব বশ।”
সুধান শ্রীপূর্ণানন্দ, “এই আদিরসে,
কোন্‌ মূর্ত্তি কোথা পরকাশ ?”
উত্তরে সন্তান, “আদিরস-মূর্ত্তি কালী,
কামরূপ ক্ষেত্রে করে বাস।
সর্ব্বকামপ্রদা কালী, যার যা কামনা,
অর্চ্চি তাঁয় পায় সর্ব্বক্ষণ,
কামরূপ ক্ষেত্র ধরা ;—চিন্তিলে বুঝিবে,—
তাঁর পূজা করে জীবগণ।
কামাখ্যা তাঁহার নাম, কাম বীজ মন্ত্রে,
আর্য্যে তাঁকে করে আরাধন।
—অনন্ত তাঁহার নাম, অনন্ত ভাষায়,
অর্চ্চি চাহে আকাঙ্ক্ষা পূরণ।
কভু কৃষ্ণ-মূর্ত্তি ধরি, যমুনা সৈকতে
করে রাস মদনমোহন।
—অপ্রাকৃত শ্যামরূপ, নবীন মদন,
কামবীজ মন্ত্রে আরাধন।

তথা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।

কাম বীজ কাম গায়ত্রী যাহার সাধন।

কৃষ্ণের স্বভাব হয় ধীর ললিত,

নিরন্তর কামক্রীড়া যাঁহার চরিত।"

সুধান শ্রীপূর্ণানন্দ; "কালী কৃষ্ণরূপে,

রাস করে, তাহার প্রমাণ,

দেখাতে কি পার অন্য সাধক বচনে?"

ধীর বাক্যে উত্তরে সন্তান,

"শ্রীরামপ্রসাদ মাতৃভাবের সাধক,

মাতৃভাবে তত্ত্ব সমুঝিয়া,

ললিত-মধুর-বাক্য-কূজন-সঙ্গীতে,

প্রকাশিল মধুর করিয়া।

কালী হলি মা রাসবিহারী।

(নটবর বেশে বৃন্দাবনে।)

পৃথক প্রণব নানালীলা তব, কে বুঝে একথা বিষম ভারী॥

নিজ তনু আধা গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ আপনি নারী।

ছিল, বিবসন কটী, এবে পীত ধটী ; এলো চুলচূড়া বংশীধারী॥

আগে মা কুটিল নয়ন অপাঙ্গে মোহিত করেছ ত্রিপুরারি।

এবে নিজ কালো, তনুরেখা ভালো, ভুলালে নাগরি নয়ন ঠারি॥

ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবনত্রাস, এবে মৃদু হাস, ভুলে ব্রজকুমারী।

আগে, শোণিত সাগরে, নেচে ছিলে শ্যামা, এবে প্রিয় তব যমুনা-বারি॥

রামপ্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাষিছে, বুঝেছি জননি, মনে বিচারি।

শ্যাম শ্যামা তনু, মহাকাল কানু, একই সকল, বুঝিতে নারি॥

(জংলা-খয়রা।)

বিষ্ণুদাস কহে, "তুমি শাক্ত মহাজন,
ইথে আর নাহি কোন সন্দেহ এখন।
যাহা কহ, তার মধ্যে আন মাতৃভাব;
মাতৃভাবে মগ্ন হওয়া তোমার স্বভাব।
বাৎসল্যের মাতৃভাব তোমার আশ্রয়,
বাৎসল্য মিশ্রিত বাক্য স্বতঃ সুধাময়।
মাতৃস্নেহ বর্ণনায় অমৃত সিঞ্চনে,
অমৃত সিঞ্চনে যথা শিশুর ভাষণে।
মা ভাবে তন্ময় তুমি, অথচ কি জন্য,
করতালি নিয়া গাও নিতাই চৈতন্য ?
প্রভাতে সন্ধ্যায় গাও চৈতন্যমঙ্গল,
ঝঙ্কারিত তোমার কীর্ত্তনে নীলাচল।"

উত্তরে সন্তান, "তুমি বুঝিয়াছ সত্য,
মা ভিন্ন জানেনা চিত্ত অন্য কোন তত্ত্ব।
শাক্ত আমি, শক্তি পূজা মোর নিত্য কর্ম্ম,
যথা শক্তি তথা ভক্তি করা মোর ধর্ম্ম।
শক্তিপূজা করিতে পূজার্হ শক্তিমান,
লোকাতীত শক্তি হ'লে অবতার নাম।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পূর্ণ প্রেমের মূরতি,
এ বিশ্ব বিজয়ে শক্ত প্রেমের শকতি।
প্রেমশক্তি মহাশক্তি ঈশ্বরে মিলায়,
প্রেম ভিন্ন বিশ্বে শান্তি কোথায় কে পায় ?
প্রেমের সমুদ্র মোর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য,
অর্চ্চি তাঁর পাদপদ্ম বিন্দু প্রেম জন্য।

খাল বিল নদী নাল যত দেখ স্থূল,
সমুদ্র যেমন সর্ব্ব জলাশয় মূল,

তথা সিন্ধু শ্রীচৈতন্য, যত ভাব ভক্তি,
বর্ত্তে ভবে, সকলের স্ফূর্ত্তিপ্রদা শক্তি।
দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর সর্ব্ব ভাব,
পূর্ণমাত্রা নিয়া গড়া চৈতন্য স্বভাব।
যত জাতি করে ভবে ঈশ্বরোপাসনা,
বিচারিলে কেহ নহে দাস্য ভাব বিনা।
সর্ব্বত্র বিনয় দাস্যভাবের লক্ষণ,
সে লক্ষণ শ্রীচৈতন্য ধর্ম্মে সর্ব্বক্ষণ।
অন্য ধর্ম্মী শ্রীচৈতন্য যদিও না মানে,
আচরে তাঁহার পন্থা স্বতঃ সাবধানে।
আমি দেখি শ্রীচৈতন্যদেবে মাতৃভক্তি,
এতভক্তি, সীমা নির্দ্ধারণে নাহি শক্তি।
অথবা আপনি কালী চৈতন্য হইয়া,
মায়ান্ধ মানবে গেল চৈতন্য দানিয়া।
আপন জীবনে উপলব্ধি মোর যাহা,
আজ সাধুমণ্ডলে নির্ভয়ে কহি তাহা।
প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি তীর্থ পর্য্যটনে,
বাহিরিনু যবে, যত বৈষ্ণব সজ্জনে,
সমাদর করি মোকে গৃহে দিত স্থান।
সম্বর্দ্ধিত মোকে সিদ্ধপুরুষ সমান।
বহু ধর্ম্মসভায় করিত নিমন্ত্রণ,
—যদিও অজ্ঞাত ভক্তি ধর্ম্ম সনাতন,—
তবুও যা বলিতাম, শুনিয়া তাহাই,
বলিত সকলে, "হেন কভু শুনি নাই।"
ক্ষুদ্র আমি, অথচ প্রাচীন তত্ত্বদর্শী,
নিষেধেও নমিত সজোরে পদস্পর্শি।

বহুদিন অনুতপ্ত চিত্তে চিন্তিয়াছি,
ভণ্ড আমি অপরাধী, পন্থা ভুলিয়াছি।
কি করি কেমনে এই বিপত্তি এড়াই,
বহুদিন তপ্ত মনে চিন্তিয়াছি তাই।
অন্য দিকে তাঁহাদের সঙ্গ সুধাময়,
ত্যাগাপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ গণিত হৃদয়।
একবার প্রধান বৈষ্ণবগণ সঙ্গে,
আসলাম নবদ্বীপে ধূলট প্রসঙ্গে।
শ্রীচৈতন্যে মোর তত বিশ্বাস ছিল না,
তবুও বৈষ্ণবগণ মোরে ছাড়িত না।
সাধারণ বৈষ্ণবেরা প্রায় শাক্তদ্বেষী ;
বলিতাম "শাক্ত আমি," তবু সবে আসি,
সম্মান করিত মোরে অতি ভক্তিভরে।
সহিতাম সে সম্মান লজ্জিত অন্তরে।
বলিতাম, "হে গৌরাঙ্গসুন্দর, তোমার
ভক্তগণে নিষেধ করহ যেন আর—
অভক্ত আমাকে কেহ না করে প্রণাম,
শাক্ত আমি,—কালীভক্ত—কালিদাস নাম।
কিংবা যদি তুমি মোর প্রিয় কেহ হও,
জানাও আমাকে, আত্মসাথ করি লও।
এক দিন শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দিরে যাইয়া
দেখি কালী বিশ্বমাতা আছে দাঁড়াইয়া।
বেলা প্রায় বারদণ্ড, বহু ভক্ত সঙ্গে,
দেখিলাম কালীরূপ, না দেখি গৌরাঙ্গে।
বিস্ময়ে ভরিল চিত্ত, গাত্র রোমাঞ্চিত,
স্থির নেত্র অশ্রুসিক্ত, হৃদয় কম্পিত।

দেখিলাম কি অপূর্ব্ব বর্ণিবারে নারি,
—পূর্ণ দিবাকরালোকে, নহে বিভাবরী।
বুঝিলাম ব্রহ্মময়ী কালী শ্রীচৈতন্য।
অবতীর্ণ মাত্র প্রেমভক্তি শিক্ষা জন্য।
নিরাকারা শক্তি ;—যবে হয় দৃশ্যমান,
তখন তাহার মূর্ত্তি হন শক্তিমান।
শক্তি আরাধয়ে আরাধিয়া শক্তিমান,
এ নিমিত্ত,শাক্তের না রহে ভেদজ্ঞান।
মহম্মদ যীশুখৃষ্ট যে দেশে যে রয়,
শক্তির প্রকাশ বলি মান্য সবে হয়।
এক শক্তি ভিন্ন অন্যে অর্চ্চনা না করি,
সেই শক্তি অর্চ্চনিতে শক্তিমানে ধরি।
শ্রীচৈতন্য শক্তি ;—শাক্ত চৈতন্যরূপিণী,
ভেদবুদ্ধি কভু নাই দোঁহে এক জানি।
বৈষ্ণবের সঙ্গে রহি বৈষ্ণবীয় ভাবে,
শ্রীব্রজমাধুরী তত্ত্ব জাগিল স্বভাবে।
প্রেমশক্তি শ্রীচৈতন্য রহি অন্তরালে,
মোকে সে মধুর ভাব বুঝাইয়া দিলে।
এ সকল গূঢ় কৃপাবার্ত্তা কব কাকে,
—অসম্ভব শ্রীচৈতন্য করুণা আমাকে !
বৈষ্ণব আমাকে বলে বৈষ্ণবপ্রধান,
শাক্তে ভাবে আমি ব্রহ্মময়ীর সন্তান।
শাক্ত আমি, মোর কোন ভেদ বুদ্ধি নাই,
আমি জানি মোর কালী চৈতন্য গোঁসাই।
রাধাতন্ত্র পড়ি দেখি হরেকৃষ্ণ নাম,
ব্রহ্ম নাম,—প্রকৃতি-পুরুষ-রস-ধাম।

মণ্ডপে দেখিনু কালী রাধাকৃষ্ণরূপা,
চৈতন্য মন্দিরে চতুর্ভুজা অপরূপা।
শাক্ত আমি চতুর্বিধ আমার আচার।
বৈষ্ণব-আচার হয় এক অঙ্গ তার।
কেন মোর আচরণ বৈষ্ণবের মতে,
আমি নাহি জানি, কালী জানে ভাল মতে।
জীবহিংসা মদ্যপান মোর অর্চ্চনায়,
নাহি লাগে ;—মন বুদ্ধি নৈবেদ্য তথায়।
সুনির্ম্মল মাতৃপূজা শিখান চৈতন্য।
আমিও না বুঝি তাহা ভিন্ন কিছু অন্য।
তাঁর মাতৃপূজার তুলনা নাহি আর,
—মাতৃপূজা চৈতন্যচরিতে অলঙ্কার।"
হাসি কহে বিষ্ণুদাস, "মোরা যাহা জানি,
কৃষ্ণপ্রেমমূর্ত্তি হন গৌর গুণমণি।
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণপূজা করেন প্রচার,
তার মধ্যে মাতৃপূজা কোথায় তোমার ?"
উত্তরে সন্তান, "কবিরাজ গ্রন্থ পাঠে,
দেখি তাঁর মাতৃপূজা প্রতি ঘাটে ঘাটে।
কৃষ্ণপ্রেমমূর্ত্তি, কিন্তু দৃষ্টি মার প্রতি ;
অতি ধীর ভাবে তাঁর মাতৃপূজা-রীতি।
তোমরা সন্ন্যাসে যাও মা বাপ ছাড়িয়া,
চৈতন্য সন্ন্যাসে যান মাতৃপূজা নিয়া।
শ্রীকৃষ্ণের মাতৃভক্তি পূর্ব্বে বলিয়াছি,
চৈতন্যের মাতৃভক্তি শুন বলিতেছি।
সন্ন্যাস লইয়া প্রভু চলে বৃন্দাবন,
শান্তিপুরে নিয়া চলে পরিকরগণ।

প্রেমাবেশ খণ্ডি যবে হল বাহ্য জ্ঞান,
অগ্রে করে মাতৃভক্ত মাতার সন্ধান।
তবে সবে শচী মায় সম্মুখে আনিল,
স্তুতিমন্ত্রে মাতৃপূজা প্রভু আরম্ভিল।

তথা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে
মধ্য লীলায় ৩য় পরিচ্ছেদে,—
"নৃত্য করি করে প্রভু নাম সঙ্কীর্ত্তন,
শচীমাতা লঞা আইল অদ্বৈত ভবন।
শচী আগে পড়িলা প্রভু দণ্ডবৎ হঞা।
কহিতে লাগিলা শচী কোলে উঠাইয়া।

*

কান্দিয়া বলে প্রভু, "শুন মোর আই,
তোমার শরীর এই মোর কিছু নাই।
তোমার পালিত দেহ, জন্ম তোমা হৈতে।
কোটী জন্মে তব ঋণ নারিব শোধিতে।
জানি বা না জানি যদি করিল সন্ন্যাস,
তথাপি তোমাকে কভু নহিব উদাস।
তুমি যাঁহা কহ, আমি তাঁহাই রহিব।
তুমি যেই আজ্ঞা কর সেই সে করিব।
এত বলি পুনঃ পুনঃ করে নমস্কার,
তুষ্ট হঞা আই কোলে করে বার বার।
তারপরে ভক্তগণ প্রতি শ্রীচৈতন্য
কন কথা শিখাইয়া জননীর জন্য।
"যদ্যপি সহসা আমি করিয়াছি সন্ন্যাস,
তথাপি তোমা সবা হৈতে নহিব উদাস।

তোমা সবা না ছাড়িব যাবৎ আমি জীব,
মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব।"

নীলাচলে রহি প্রভু মাতার আজ্ঞায়,
জনে জনে মার কাছে নদীয়া পাঠায়।
পুত্র যেন দূর দেশে রহি উপার্জ্জনে,
লোক পাঠাইয়া নিজ জননী অর্চ্চনে।

তথা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে
মধ্য লীলায় ১৫শ পরিচ্ছেদে—

"শ্রীবাস পণ্ডিতে প্রভু করি আলিঙ্গন,
কণ্ঠ ধরি কহে তাঁরে মধুর বচন,
"তোমার ঘরে কীর্ত্তনে আমি নিত্য নাচিব,
তুমি দেখা পাবে আর কেহ না দেখিব।
এই বস্ত্র মাতাকে দিও, এ সব প্রসাদ,
দণ্ডবৎ করি আমার ক্ষমাইও অপরাধ।"

তথা অন্ত লীলায় ৩য় পরিচ্ছেদে,—

"আর দিনে দামোদরে নিভৃতে বোলাইলা,
প্রভু কহে, "দামোদর চলহ নদীয়া।
মাতার সমীপে তুমি রহ তাঁহা যাঞা।
তোমা বিনা তাঁহার রক্ষক নাহি দেখি আন,
আমাকেই যাতে তুমি কৈলে সাবধান।

* * * *

মাতার গৃহে রহ যাই মাতার চরণে,
তব আগে না করাও স্বচ্ছন্দাচরণে।
মধ্যে মধ্যে কভু আসিও আমার দর্শনে,
শীঘ্র করি পুনঃ তাঁহা করিও গমনে।

মাতাকে কহিও মোর কোটী নমস্কারে।
মোর সুকথায় সুখী করিও তাঁহারে।
"নিরন্তর নিজ কথা তোমারে শুনাইতে,
এই লাগি প্রভু মোরে পাঠাইল ইঁহাতে।
এত কহি মাতার মনে সন্তোষ জন্মাইও।
আর গুহ্য কথা তাঁরে স্মরণ করাইও।
"বারে বারে আসি আমি তোমার ভবনে।
মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন সব করিয়া ভোজনে।"
এই মত বার বার করাইও স্মরণ,
মোর নাম লঞা তাঁর বন্দিও চরণ।"

তথা অন্ত লীলায় ১২শ পরিচ্ছেদে,—

"পূর্ব্ব বর্ষে জগদানন্দ আই দেখিবারে,
প্রভুর আজ্ঞা লঞা আইলা নদীয়া নগরে।
আইর চরণ যাই করিল বন্দন।
জগন্নাথের বস্ত্র প্রসাদ কৈল নিবেদন।
প্রভুর নাম করি মাতাকে দণ্ডবৎ কৈলা।
প্রভুর মিনতি স্তুতি মাতারে কহিলা।
জগদানন্দ কহে, "মাতা কোন কোন দিনে,
তোমার এথা আসি সুখে করেন ভোজনে।
ভোজন করিয়া কহে আনন্দিত হঞা,
মাতা আজি খাওয়াইল আকণ্ঠ পূরিয়া।
আমি যাই ভোজন করি মাতা নাহি জানে,
সাক্ষাতে খাই আমি, তিঁহো স্বপ্ন মানে।"

তথা অন্ত লীলায় ১৯শ পরিচ্ছেদে,—

"প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত জগদানন্দ,
যাঁহার চরিত্রে প্রভু পায়েন আনন্দ।

প্রতি বৎসর প্রভু তাঁরে পাঠান নদীয়াতে।
বিচ্ছেদ-দুঃখিতা জানি জননী আশ্বাসিতে।
"নদীয়া চলহ মাতাকে কহিও নমস্কার।
আমার নামে পাদপদ্ম ধরিও তাঁহার।
কহিও তাঁহাকে তুমি করিও স্মরণ,
নিত্য আসি আমি তোমার বন্দিযে চরণ।
যে দিন তোমার ইচ্ছা করাইতে ভোজন,
সে দিন আসিয়ে অবশ্য করিয়ে ভক্ষণ।
তোমার-সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস,
বাউল হইয়া আমি কৈল ধর্ম্ম নাশ।
এই অপরাধ তুমি না লইও আমার,
তোমার অধীন আমি পুত্র সে তোমার।
নীলাচলে আছি আমি তোমার আজ্ঞাতে।
যাবৎ জীব তাবৎ আমি নারিব ছাড়িতে।"
গোপ লীলায় পায় যেই প্রসাদ বসনে,
মাতাকে পাঠান তাহা পুরীর বচনে।
জগন্নাথের উত্তম প্রসাদ আনিয়া যতনে,
মাতাকে পৃথক পাঠান, আর ভক্তগণে।
মাতৃভক্তগণের প্রভু হন শিরোমণি।
সন্ন্যাস্ করিয়া সদা সেবেন জননী।"

এই ত চৈতন্যদেব-চরিত্র গরিমা!
এই ত তাঁহার মাতৃভক্তি অনুপমা।
স্মরিতে জননীবার্ত্তা ঝরে আঁখি-জল।
এই তাঁর কৃষ্ণপ্রেম ভুবন-মঙ্গল।
এই মাতৃভক্তিযুক্ত প্রেম গঙ্গাজল।
এই ভক্তিরত্ন প্রেমহারে সমুজ্জ্বল।

এই মাতৃভক্তি বিনা মিথ্যা কালীপূজা।
এই মাতৃপূজায় সন্তুষ্টা চতুর্ভুজা।
এই মাতৃরূপে সেই চতুর্ভুজা হয়।
ঘরে ঘরে মাতৃরূপে সেই একা রয়।
মা মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি জানিও তাঁহার।
কালী ত নিরূপা, রূপ মা-রূপে প্রচার।
কালীপূজা তথায়, যথায় পূজা মার।
কালী-ভাবে শুদ্ধ মাতৃভাব অঙ্গীকার।
কাল ব্রহ্ম, কাল সত্য, কাল মহেশ্বর।
কালী তাঁর শক্তি, কালী কাল-কলেবর।
বাৎসল্যের মূর্ত্তি কালী, বরাভয়দাত্রী।
বিশ্ব তাঁর কোলে, তাই নাম জগদ্ধাত্রী।
　বিষ্ণুদাস কহে, "সাক্ষী কি আছে তাহার?
শ্রীচৈতন্য অর্চ্চে কালী দুর্গা, কিংবা আর।
নিজ নিজ মাতৃপূজা কে বা নাহি করে।
তাহে কালীভক্ত মধ্যে কে তাহাকে ধরে।"
　উত্তরে সন্তান, "মূলে ভাব অঙ্গীকার।
মাতৃভাব না ধরিলে, বুঝাব কি আর।
তুমি ত বৈষ্ণব কান্ত ভাবের সাধক,
রাধাকৃষ্ণ ভাবি, তুমি বিশ্ব উপাসক।
তারপরে, তুমি শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পণ্ডিত।
বৈষ্ণবীয় গ্রন্থ-তত্ত্ব তোমার বিদিত।
দাক্ষিণাত্য প্রভু যবে করেন ভ্রমণ,
অষ্টভূজা শক্তিমূর্ত্তি করেন পূজন।
কালী দুর্গা শিব বিষ্ণু যাহা দেখিতেন,
ভক্তির শ্রীমূর্ত্তি প্রভু অর্চ্চি চলিতেন।

পুনঃ শুন, অনেকেই বৈষ্ণব মণ্ডলে,
কালীকে প্রণাম করা অপরাধ বলে।
কালীর প্রসাদে তারা গণে মহাপাপ,
কালীনাম শুনে যদি, জনমে সন্তাপ।
কিন্তু পুরীক্ষেত্রে ছিল বসতি যখন,
শ্রীমহাপ্রসাদে ছিল প্রভুর ভোজন।১
বিমলার প্রসাদ প্রসাদে না মিশিলে,
শ্রীমহাপ্রসাদ নাহি হয় কোনকালে।
জগন্নাথ প্রদক্ষিণ সময়ে, প্রত্যহ,
বিমলা কি বাদ দিয়া চলিতেন, কহ।
বিমলা ত চতুর্ভুজা কালীমূর্ত্তি হয় ;—
—এ বিষয়ে আর বেশী বচনীয় নয়।

জননী ব্যতীত যদি জন্ম অসম্ভব,
আছে বিশ্বমাতা, যাহে বিশ্বের উদ্ভব।
জননীর জননী সে, আমারও জননী,
পরমাপ্রকৃতি রূপে নিত্য প্রসবিনী।
মাটী মোর প্রতি মাটী—প্রতি মা প্রতিমা।
প্রতি মা লইয়া বিশ্ব—বিশ্বই প্রতিমা।

পরমাপ্রকৃতি কালীরূপা কিসে হয়,
কহি তার পরিচয় শুন মহোদয়।
কালীভক্ত যে সাধক অগ্রে নিজ ঘরে,
জনক জননী সেবা দৃঢ় করি ধরে।
অতল অকূল সিন্ধু জিনি মাতৃস্নেহ,
প্রত্যক্ষে নিরখে সেই ভক্ত অহরহ।

১। অতি প্রাচীন কাল হইতে জগন্নাথ মন্দিরে বিমলার সম্মুখে সপ্তমী অষ্টমী ও নবমী তিন দিন ছাগবলি হয়। মহাপ্রভুর জগন্নাথক্ষেত্রে বাসের সময়ও হইত।

ক্রমে মাতৃ ভাবতত্ত্বে হয় সমাসীন।
দেখে বিশ্ব একমাত্র মাতৃস্নেহাধীন।
ভ্রাতৃময় বিশ্ব তার—তার মার পুত্র,
ভিন্ন কেহ বিশ্বে নাই, ইহা সত্য সূত্র ॥
রমণী দর্শনে হয় মাতৃভাব স্ফুর্ত্তি।
প্রতি রমণীতে দেখে মা কালীর মূর্ত্তি।
ভাবারূঢ় ভক্ত প্রায় উন্মাদের ন্যায়।
রমণী পাইলে কোলে উঠিবারে ধায়।
কেহ বলে নির্লজ্জ, উন্মাদ কেহ বলে,
ভোজন ব্যাপারে প্রায় শিশু তুল্য চলে।
যে জাতি হউক হাতে যাহা কিছু দেয়,
বিলম্ব না করি শিশু তুল্য তাহা খায়।
বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা নাহি ভেদ জ্ঞান,
সর্ব্বত্র সে রহে ঠিক শিশুর সমান।
স্নেহ পাইলে বড় তুষ্ট, তাড়নে সন্ত্রাস,
মান অপমান শূন্য, সদা মুখে হাস।
অনিষ্ট করিলে প্রতিহিংসা নাহি চায়,
কর্ণ মলি ডাকিলে আবার ফিরে যায়।
নাচ গান দেখিতে অত্যন্ত ভালবাসে।
ভাল মন্দ নাহি বোধ, দোখ ঘুম আসে।
মহাবিদ্যা সন্তান শিশুর তুল্য রহে।
জিজ্ঞাসিলে জ্ঞানগর্ভ তত্ত্বকথা কহে।
সাধনার গূঢ়তম উচ্চ তত্ত্ব যত,
তার মুখে উচ্চারিত হয় অবিরত।
শিশু তুল্য সরল, পণ্ডিত তুল্য জ্ঞানে,
হীন তুল্য অমান, সম্রাট তুল্য মানে—

বৃক্ষ তুল্য অধীন, স্বাধীন সিন্ধু তুল্য,
দানে তুল্য হিমালয়, সর্ব্বদা প্রফুল্ল—
নিঃস্বার্থ নদীর তুল্য, গিরি তুল্য ধীর—
চন্দ্র তুল্য শীতল, সাহসী তুল্য বীর—
সর্ব্বদা অভাবশূন্য—আকাশের মত।
ত্রয়োস্পর্শ মঘা তার কাছে তিথ্যমৃত।
মা ভাবে তন্ময় হয় সাধক যখন,
এই সব হয় তার স্বভাব লক্ষণ।
শুদ্ধ ভাগবত হয় তার গুণগান।
তার সেবা করিলে সন্তুষ্ট ভগবান।
কালীমূর্ত্তি পূজিলেই কালী পূজা নয়।
তার মধ্যে আছে গূঢ় রহস্য-নিলয়।
সে রহস্য অনুভবে জন্মে যার শক্তি,
সেই চিনে, সেই মানে, অর্চ্চে আদ্যাশক্তি।
ভক্তি ভিন্ন সে অর্চ্চনে নাহি অধিকার।
—ভক্তি তুল্য অমূল্য সম্পত্তি কোথা কার?
ভক্তিপ্রেমমূর্ত্তি প্রভু চৈতন্য গোঁসাই,
অর্চ্চি তাঁকে, তাঁর পদে মাতৃভক্তি চাই।”
সিদ্ধান্ত শুনিয়া বিষ্ণুদাস কহে, “ধন্য,
সর্ব্বদা সদয় তোমা প্রভু শ্রীচৈতন্য।
হেন মাতৃভাবে হেন কালী অর্চ্চনায়
বিদ্বেষী যে, যথার্থ নাস্তিক সে ধরায়।
হেন মাতৃপূজা ভুলি কৃষ্ণভক্ত হলে,
কৃষ্ণের করুণা কভু কারো নাহি মিলে।
শ্রীচৈতন্যপ্রিয় তোমা করি প্রণিপাত।
সন্তান ভূমিষ্ঠ, জোড় করি দুই হাত।

শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী

ষষ্ঠ দিন

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদীপে—
আদ্যেষু বাক্যেষু চ কা ত্বদন্যা।
মমত্ব গর্ত্তেঽতিমহান্ধকারে
বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম্॥১

আয়ু-সূর্য্য প্রায় অস্ত যায়,
ঘোর অন্ধকারে বিশ্ব মোর
আচ্ছাদিল ; মোহ-মত্ততায়
আর চিত্তে নাহি আসে জোর!

হে দেবি, বিবেকবৈরাগ্য-প্রকাশক, জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত অগণ্য শাস্ত্র থাকিতে, জ্ঞানময় মহাপুরুষ-ঋষিগণের লক্ষ লক্ষ উপদেশ থাকিতে ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন মায়ামমত্ব-গর্ত্তে এই বিশ্বকে অনবরত ঘুরাইতে তোমা ভিন্ন আর কে আছে? (তাই তোমার চরণতলে এখন এই প্রার্থনা, আর সংসারচক্রে না ঘুরাইয়া তোমার অমৃতপূর্ণ চরণ-কমলের অমৃত পান করিতে অধিকার দেও।)

ইহ সুখ স্বপ্নের সমান
উপলব্ধি হ'তেছে এখন।
তাহে আর ইচ্ছা নহে প্রাণ
নাহি বাঞ্ছে ভূতের নর্ত্তন ॥

সুদুর্লভ জীবন লভিয়া
যে কু কার্য্যে করিয়াছি ক্ষয়,
আশীর্ব্বাদ অগ্রাহ্য করিয়া
মাত্র অনুতপ্ত এ হৃদয় !

উদ্দেশ্য করিয়া তুচ্ছ সুখ
যে কু কার্য্যে দণ্ড ভোগিয়াছি,
না চিন্তিয়া ভবিষ্যৎ দুখ
আবার সে-কার্য্য করিয়াছি ॥

আবার আবার সেই চর্ব্বিত চর্ব্বণে,
এ অন্ত সময়ে নিস্তারিণি !
আর বাঞ্ছা নাহি ; ক্ষমা প্রাপ্তি ও চরণে,
মোহঘোরে নিস্তার জননি !

দশ দিক অন্ধকার ; সিন্ধুকূলে একা
বসে আছি পারের আশায়,
পাব কি না পার, মাগো, দিবে না কি দেখা ?
ভুলুয়ার কি হবে উপায় !!

আমার করুণাময়ী কালীনাম সার রে।
কালী ভিন্ন ভবে মোর কেহ নাহি আর রে।

কালী-পাদপদ্মে বুকে পারিয়াছি হার রে।
সে গৌরবে সদানন্দে আছি অনিবার রে ॥
সুখ দুঃখ নাহি জানি কালীর সন্তান রে।
নাহি জানি উন্নতি পতন মানামান রে ॥
মা যে ভাবে যথা রাখে তাই মোর সুখ রে।
মা-নাম যেদিন ভুলি সেই দিন দুখ রে ॥
জননী-প্রসঙ্গ-সঙ্কীর্ত্তন যদি পাই রে।
ঐশ্বর্য্য-প্রভুত্ব-সুখ কিছু নাহি চাই রে ॥
জগদ্ধাত্রী কালী পাদপদ্মে যার মতি রে।
কামাদির হীন পথে নাহি তার গতি রে ॥
ভুলুয়া রহিত যদি হেন কালী পায় রে।
তবে কি তাহার কাল পাপে তাপে যায় রে ॥

কহে মহাবীর দাস, "শুন মহোদয়!
ঐশ্বর্য্য প্রভুত্ব নাশে অধৈর্য্য কে নয়?
পুত্রশোক সহ্য করে; কিন্তু বিত্তশোকে
উন্মাদ হইয়া লোক ফিরে ইহ লোকে।"

উত্তরে সন্তান, "কালীভক্তি আছে যার,
জানে সে কালের খেলা কত চমৎকার!
কালে দিবারাত্রি হয়, হয় ঋতু মাস,
জীবভাগ্যে সুখ দুঃখ কালে পরকাশ।
কালে জন্ম, কালে মৃত্যু, উন্নতি পতন,
কাল সর্ব্বমূলে, তত্ত্ব জানে সে সজ্জন!
কালের হৃদয়ে শক্তি কালী জগদ্ধাত্রী,
অতএব কালী সর্ব্বমূলে অভিনেত্রী।
কালী দিলে সুখৈশ্বর্য্যে নাহি থাকে পার;
কালী নিলে রক্ষা করে হেন সাধ্য কার!!

ভক্ত জানি সুবৈরাগ্যে দৃঢ় সেই হয়,
ঐশ্বর্য্য প্রভুত্ব নাশে চঞ্চল সে নয় ॥
এ সংসার রঙ্গমঞ্চে সুখ দুঃখ নিয়া
সে কালীর নিত্য অভিনয়,
তাঁর পুত্র তাঁর অভিনয় নিরীক্ষিয়া,
নাহি হয় চঞ্চল হৃদয়।"
সুধান মাধবদাস, "তেমন বৈরাগী;
—সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত, হৃত যার,
—অন্যায় বিচারে শেষে গৃহ বিতাড়িত,
তবু ধৈর্য্য অন্তরে তাহার।
কোথাও কি দেখিয়াছ ?" উত্তরে সন্তান,
"সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প তেমন ধীমান।
একবার হিমালয় করিতে ভ্রমণ,
এক মুক্তপুরুষে করিনু দরশন।
জাতিতে ব্রাহ্মণ, তার নাম শ্রীঅচল,
দিব্য দেহধারী, অঙ্গে উপযুক্ত বল।
জিজ্ঞাসিয়া পরিচয়,
জানিনু সে সদাশয়,
সম্ভ্রান্ত ধনীর পুত্র; জ্ঞাতি বন্ধুগণ,
তাহার ঐশ্বর্য্য সব করিয়া লুণ্ঠন,
দিয়াছিল কারাগারে
অবিচারে অত্যাচারে,
লাঞ্ছনায় জর্জ্জরিত করিল যখন,
তখন সন্ন্যাসে বিপ্র করিল গমন।

নিস্পৃহ হইয়া এবে করিছে ভ্রমণ,
জগদ্ধাত্রী গুণগানে সর্ব্বদা মগন।

নাহি বাস, নাহি বিত্ত,
তবু সদা ফুল্ল চিত্ত,
মৃদুহাসে হাস্যময় সর্ব্বদা বদন,
—সরল সুস্থির-দৃষ্টিপূর্ণ দুনয়ন ॥
জিজ্ঞাসিনু, "আপনার
চিত্তে কি জনমে আর
অতীত ঐশ্বর্য্যব্যথা ? অথবা দুর্জ্জন
জ্ঞাতি বন্ধু প্রতি হিংসা আসে কি এখন ?
লুণ্ঠি রম্য বাসস্থান,
নিত্য করি হতমান,
দেশত্যাগী করি যারা দিল আপনায়,
জনমে কি চিত্তে ক্রোধ তাদের চিন্তায় ?"
ধীরভাবে উত্তরিল মোকে সে ব্রাহ্মণ,
"বিগত শৈশব-খেলা কে করে স্মরণ ?
স্বপ্নসুখ যত্ন করি কে স্মরণ রাখে ?
পথিকের বৃথা গল্প কার মনে থাকে ?
ইচ্ছাময়ী কালী ; তাঁর ইচ্ছামত জীব,
কভু হয় কীট, কৃমি, কভু হয় শিব,
সে যাকে যেমন রাখে,
ভবে সে তেমন থাকে ।
কি হল কি হবে চিন্তা ভ্রান্তি ভিন্ন নয়,
জীবের কর্ত্তব্য মাত্র তাঁর পদাশ্রয় ।
যাকে দিয়া যা করায়,
তাহাই সে করি যায়,
স্বকর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ ঘটে তায় ।
কাকে ভাল, কাকে মন্দ, বলিব তাহায় !

তুমি আমি যত যাহা,
কালে সমুৎপন্ন তাহা,
কালে হ্রাস বৃদ্ধি, কালে সৃজন সংহার ;
কাল কর্ত্তা, কিন্তু কালী তার মূলাধার !
বসিয়া কালের বুকে,
রঙ্গময়ী মনসুখে,
করিতেছে কত রঙ্গ জীবসঙ্ঘ নিয়া,
সে রঙ্গ সমুঝি মোর আনন্দিত হিয়া ।
সম্পত্তি গিয়াছে বলি,
কান্দি নাই অশ্রু ফেলি,
নিন্দি নাই প্রবঞ্চকে অন্যের নিকটে,
হই নাই ধৈর্য্যচ্যুত পড়িয়া সঙ্কটে ॥
প্রেমের মিলন যথা,
বিরহের বহ্নি তথা,
জনম যথায়, মৃত্যু বিহরে তথায় ।
স্বাভাবিক এ সকল-দৃশ্য এ ধরায় ॥
সম্পত্তি যাহার আছে,
বিপত্তি তাহার পাছে,
দারিদ্র্য অভাব তার বংশধর প্রায়,
—দিবসের পাছে পাছে বিভাবরী ধায় !
সম্পদে বিতৃষ্ণ যারা,
দারিদ্র্য কি সহে তারা,
ব্রহ্মচারী কুমারে কি পুত্রশোক পায় ?
আকাঙ্ক্ষা অনর্থমূল কহিনু তোমায় ॥
আকাঙ্ক্ষা আমার নাই,
অনর্থকে আর তাই

না ডরাই আমি, তোমা কহিলাম সার।
অতীত ত দূরে ; ভাবী-চিন্তা নাহি আর।
যখন যে ভাবে রই,
নিরানন্দ কভু নই,
স্তুতি নিন্দা, মানামান সুখ-দুঃখ আর,
কালীর কৃপায় সব সমান আমার।
কালী পাদপদ্মে আছি নির্ভর করিয়া,
কালী যা মিলায় আমি তৃপ্ত তাই নিয়া।
না পাইলে প্রাপ্তি হেতু না করি উদ্যোগ,
—শান্ত করিয়াছি আমি বাসনার রোগ।
জরা মৃত্যু দুই জন,
কেশাকর্ষে অনুক্ষণ,
দিন দিন তনু ক্ষীণ, ক দিন বা রব ?
বিত্ত নাশে আর কেন বিচলিত হব ?
আমি তুচ্ছ মহাবলী,
প্রহ্লাদের পৌত্র বলি,
অগাধ ঐশ্বর্য্য আর প্রভুত্ব অবাধ,
হারাইয়া বিন্দু না করিল প্রতিবাদ।
নিজ ভুজবীর্য্য বলে,
বীরশ্রেষ্ঠ বিশ্বতলে,
শক্তিমান হইয়াও সহি অপমান,
সিন্ধুতীরে হৃষ্টচিত্তে করিল পয়ান।
চক্রী বিষ্ণু চক্র করি,
সর্ব্বস্ব লইল হরি,
তাহে বিন্দু বিচলিত নহে তার প্রাণ,
নিজে নিরমিয়া রাজ্য নিজে কৈল দান।

ইন্দ্র তার ধৈর্য্য দেখি বিস্ময় মানিয়া,
গিয়াছিল শতমুখে ধন্যবাদ দিয়া।”

জিজ্ঞাসিলে সে বৃত্তান্ত কহিল ব্রাহ্মণ,
—ভারতে বর্ণিত আছে জানে বহুজন।
“দেবতা দানব কিংবা মানব এমন
না ছিল ত্রিলোক মধ্যে
বলির সহিত যুদ্ধে,
দণ্ড তরে স্থির রবে ; করি পলায়ন,
—যে যতই যোদ্ধা হোক,—রক্ষিত জীবন।
দেবরাজ পুরন্দর,
যুদ্ধে হয়ে অগ্রসর,
পলে পরাজিত হয়ে করে পলায়ন,
বলি পায় ঐরাবত স্বর্গ সিংহাসন।
বজ্রের গর্জ্জন স্তব্ধ,
সমুদ্রের নাহি শব্দ,
দাসত্ব স্বীকারে যত স্বর্গের ভূষণ।
নিঃশব্দে দানব ভয়ে প্রবাহে পবন।

যুদ্ধ করি বলিকে করিতে বাধ্য আর,
স্বর্গে না রহিল সাধ্য কোন দেবতার।
দাসত্ব-শৃঙ্খল-হার,
বক্ষে শোভে দেবতার,
দাসীবৃত্তি অলঙ্কার সুর-ললনার।
স্বর্গের দুর্গতি বাক্যে বরণন ভার।

যায় যুগ, যায় কল্প, সহস্র বৎসর,
অক্ষুণ্ণ প্রভুত্ব বলি ত্রিভুবনেশ্বর।

মহাযজ্ঞ আরম্ভিল,
নিজে কল্পতরু হ'ল।
প্রাপ্ত হল সুচক্রজ্ঞ বিষ্ণু অবসর,
ধরিয়া বামনমূর্ত্তি হল অগ্রসর।

ভিক্ষার্থী হইয়া বিষ্ণু বলিকে ছলিয়া,
সর্ব্বস্ব হরিয়া সত্যে দিল তাড়াইয়া।
হৃতরাজ্য পুরন্দরে,
আনি বিষ্ণু নিজ করে,
ত্রিলোকের আধিপত্যে যত্নে বসাইল।
আধিপত্য লভি ইন্দ্র আত্ম পাসরিল।
চড়ি ঐরাবতোপরে,
মহাবজ্র নিয়া করে,
দেবসৈন্য সঙ্গে করে সর্ব্বদা ভ্রমণ।
—সর্ব্বদা বলির ভয়ে সংশয়ে মগন॥

একদিন সিন্ধুতীরে নির্জ্জন গুহায়
ইন্দ্র দেখে বলি—শ্রেষ্ঠ তাপসের প্রায়।
শোকদুঃখ পরিশূণ্য
পরম আনন্দে পূর্ণ,
মুক্ত পুরুষের মত স্থিরনেত্রে চায়,
জ্যোতির্ম্ময় চন্দ্র যেন ভূতলে বেড়ায়।

বলি দেখি বিকম্পিত ইন্দ্রের হৃদয়,
সর্ব্ব অঙ্গ রোমাঞ্চিত, চিত্তে মহাভয়।
ভাবে, "বেটা এত কাল
মরে নাই, কি জঞ্জাল,
আবার ধরিলে অস্ত্র ঘটাবে প্রলয়।"

ভীত ইন্দ্র ; মুখে বীরবাক্য উগারয়।
(—অপদার্থ নরের প্রকৃতি যাহা হয় ॥)

দণ্ডাইয়া ঐরাবত, বল করি গায়,
বজ্র তুলি গর্ব্বে ইন্দ্র বলিকে সুধায়।
"কহ কি প্রকার আছ,
চিনিতে কি পারিয়াছ ?
আমি ইন্দ্র তোমার সাম্রাজ্য অধিকারী
তব রত্ন-সিংহাসন এখন আমারি ॥

প্রচণ্ড বিক্রম ঘোরে,
সংগ্রামে জিনিয়া মোরে,
কাড়ি নিয়া ঐরাবত, করি আরোহণ,
রাজছত্র শিরে দিয়া,
রাজদণ্ড করে নিয়া,
একদিন পরানন্দে করিতে ভ্রমণ,
হের, পুনঃ ঐরাবত আমারি এখন ॥

তব সৈন্য সেনাপতি
যাহারা তোমার প্রতি
অনুরক্ত ছিল, তারা মোর সুবিচারে,
হইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ আছে কারাগারে।
আর যারা তোমা ভুলি
খায় মোর পদধূলি,
তাহাদিগে উচ্চপদে রাজ্যে বসাইয়া
তোমার আত্মীয়গণে,
রাখিয়াছি নির্য্যাতনে,

সুন্দরী দানবী-নারী ধরিয়া আনিয়া,
করাই ইতর কর্ম্ম দাসী বানাইয়া ॥

তোমার মহিষীবৃন্দ এক্ষণে আমার
মনস্তুষ্টি বিধান করিছে অনিবার।
মণিরত্ন স্বর্ণসার—
—পরিপূর্ণ ধনাগার,
আমি এবে স্বেচ্ছামত করি ব্যবহার।
দৈত্যলোক জীর্ণ শীর্ণ সহি কর-ভার ॥
তোমার শঙ্কায় যারা,
মৃতপ্রায় সংজ্ঞাহারা
ছিল, সেই দেবগণ এক্ষণে আমার
রাজত্বে, নির্ভয়ে গায় অকীর্ত্তি তোমার।

তোমার আত্মীয় যারা,
তোমার দুর্দ্দশা তারা,
জানিয়াও আর তোমা সাহায্য না করে।
ফুকারিতে তব নাম মরে মোর ডরে ॥
কি লাঞ্ছিত হীন দীন জীবন তোমার।
অন্যে হ'লে লাজে প্রাণ করে পরিহার !!"

যা কহিল হীনচিত্ত দীন পুরন্দর,
মৃদুহাস্য করিল তা শুনি দৈত্যেশ্বর।
যদিও ইতর বাক্য উপেক্ষে প্রবীণ,
তবু হিতবাক্য তারা বলে চিরদিন।
না বলিলে অজ্ঞ যারা,
তত্ত্ব কি সমুঝে তারা ?

হিতবাক্যে উপকৃত নিত্য জ্ঞানহীন।
সম্বোধিল ইন্দ্র তাই সত্যে সমাসীন—
"আধিপত্য লাভ করি;
অজ্ঞ সম গর্ব্বে মরি
বহু তিরস্কার তুমি করিলে আমায়—
শুনিলাম ; সময়ে সকলি শোভা পায় !!

গজেন্দ্র মরিলে মহা সিংহের সমরে,
কুকুর নির্ভয়ে আসি মাংসাহার করে।
গর্ত্ত ছাড়ি উঠি ভেক গজপতি শিরে,
নৃত্য করি কত আত্মশ্লাঘা পরচারে।
পিঞ্জরে আবদ্ধ সিংহ কৌশলে যখন,
কুকুটীও করে তার সম্মুখে গর্জ্জন।

বলবীর্য্যে যদি তুমি জিনিয়া আমায়,
লভিতে রাজত্ব মোর, কীর্ত্তি এ ধরায়
রহিত তোমার ; লোকে প্রশংসা করিত
নিরলাজ কাপুরুষ কেহ না কহিত।

স্বর্গের প্রভুত্ব লভি বিষ্ণুর কৃপায়
রাজছত্র শিরে ধর,
স্ত্রীপুত্র পালন কর,
বিষ্ণু বিনা পলায়ন পর্ব্বত গুহায়,
—কাহার অজ্ঞাত তব বীরত্ব ধরায় ?
নির্লজ্জ অধম যারা,
নির্লজ্জ বলিতে তারা

ত না হয় কভু ; শ্রেষ্ঠ যদি পায়,
নির্লজ্জ বলিয়া তাকে স্বজাতি বাড়ায় !
চিন্ত ত্রিদিবের স্বামী,
তেমনি কি নও তুমি ?
যুদ্ধে পলায়ন, পরবলে বলীয়ান,
অথচ লভিতে চাও বীরের সম্মান !

মোর দ্বারে ভিক্ষার্থী হইয়া গোলকেশ,
আসিলেন ধরি ক্ষুদ্র বামনের বেশ।
সম্মুখ সমরে নহে, ভিক্ষার্থী হইয়া,
ত্রিলোকের আধিপত্য নিলেন মাগিয়া।
ভূজবলে রাজ্যলাভ করিয়াছিলাম,
ভিক্ষুকে করিয়া দয়া করিলাম দান।
সে ভিক্ষুক তোমার দুর্গতি নিরখিয়া,
তোমাকে দিলেন রাজ্য করুণা করিয়া।
ভিক্ষুকের কাছে যার
ভিক্ষাবৃত্তি, তার আবার,
বলির সম্মুখে বলদর্পে কি গৌরব ?
—বাঞ্ছে কি জগত এবে গোবরে সৌরভ ?

বিষ্ণু তোমা আধিপত্য করিলেন দান,
তার জন্য কেন এত গর্বিত পরাণ ?
বিষ্ণুবলে কিছু বল সাঞ্চয়াছে বুকে,
দাঁড়াইছ তাই বজ্র তুলিয়া সম্মুখে।
নহি আমি অধিকৃত,
নহি যুদ্ধে পরাজিত,

ইচ্ছা হলে পুনঃ অস্ত্র করিয়া ধারণ,
প্রজ্বলিয়া সমরে প্রলয় হুতাশন
শত শত ইন্দ্র গর্ব্ব,
মুহূর্ত্তে করিয়া খর্ব্ব,
খেদাড়িয়া স্বর্গ হ'তে অপদার্থগণ
নিতে পারি স্বর্গে মর্ত্ত্যে যত সিংহাসন।
যে তুচ্ছ বাসনাধীন,
হয়ে তুমি লজ্জাহীন,
পুরুষানুক্রমে সহ লাঞ্ছনা ভীষণ
চূড়ান্ত নিষ্পত্তি তার
করিয়াছি ; আর আমার
সে সব বাসনা নাহি জাগে একক্ষণ।
এখন বাসনাক্ষয় মোর প্রয়োজন।

দেহাত্মবুদ্ধির বশে মোহাবিষ্ট নর ;
দেহসুখ অন্বেষণে সদা অগ্রসর।
কতক্ষণ রবে ভবে,
প্রভুত্ব কি সঙ্গে যাবে,
মুদ্রিত হইলে চক্ষু, কে নিজ কে পর,
কে কার রাজত্ব করে, কার বাড়ী ঘর ?
এ সকল চিন্তা যার,
ভোগেচ্ছা কি রহে তার ?
ক্ষণস্থায়ী সংসারের প্রভুত্ব বাসনা,
তত্ত্বদর্শী-প্রবীণের অন্তরে আসেনা।

অদ্য যথা সিন্ধু কল্য পর্ব্বত তথায়,
অদ্য যে সম্রাট কল্য চলে সে ভিক্ষায়।

উন্নতি বা অধোগতি,
অধীন বা অধিপতি,
যাহা হয় মানবের কর্ত্তৃত্ব কি তায় ?
কর্ত্তা সেই, বিশ্ব চলে যাহার ইচ্ছায়।
তুমি আমি আমাদের কর্ত্তা যদি হই,
জন্মের সময় বল,
সে কর্ত্তৃত্ব কোথা ছিল ?
মৃত্যুকালে সে কর্ত্তৃত্বে কে জীবিত রই !
এ তনু রক্ষার তরে,
প্রাণপণে যত্নভরে,
কে বা না সতর্ক রহে ? কিন্তু চিরকাল
কে কোথা বাঁচিয়া রহে কহ সুরপাল।
তত্ত্বজ্ঞ মনস্বী যাঁরা,
ধ্বংস-তত্ত্ব জানি তাঁরা,
বিত্ত-পুত্র-ক্ষেত্র-নাশে না হন অধীর।
ধ্বংসমুখে চলে সবে ইহা চির স্থির ॥

বিষ্ণু ছলে লভি রাজ্য হইয়া নির্ভয়,
বৃথা গর্ব্বে মরিও না ; কখন কি হয়,
কেহ না বলিতে পারে,
চরাচর এ সংসারে,
চঞ্চলা বিজলীতুল্য ভাগ্য বিপর্য্যয়।
সম্পত্তি বিপত্তি যত,
আসে দিবারাত্রি মত ;
এ তত্ত্ব যে জানে, সে কি জয়ে মত্ত হয় !
—পরাজয়ে তার চিত্তে না উপজে ভয় ॥

যে প্রভুত্ব মোর ছিল,
কালে তব হস্তে গেল,
দুরবস্থা মোর ; কিন্তু অবস্থা তোমার,
কল্য কি ঘটিবে তা কি চিন্ত একবার ?

তব সম কত ইন্দ্র,
কত বা মহা মহেন্দ্র,
কত এল কত গেল, বরষার জল !
মৃত্যু যদি সুনিশ্চিত, গর্ব্বে কোন্ ফল ?

আমার প্রভুত্ব আজ গিয়াছে খলিয়া,
মোর মনে দুঃখ নাই তত্ত্ব বিচারিয়া।
প্রভুর উপরে প্রভু বিরাজে যখন,
তখন প্রভুত্বে আশ,
তাহা মাত্র পরিহাস !
যাঁর দণ্ড না পারি করিতে অতিক্রম,
প্রভুত্ব অপেক্ষা তাঁর দাসত্ব উত্তম।
তাঁর পাদপদ্ম স্মরি,
তাঁর নাম বুকে ধরি,
তাঁহার ইচ্ছায় ইচ্ছা দিয়া বিসর্জ্জন,
আছি তাঁর করুণার আশায় এখন।

ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব যাহা,
তুচ্ছাপেক্ষা তুচ্ছ তাহা,
দণ্ডে দণ্ডে হয় যার উত্থান পতন
এমন ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব মত্তের লক্ষণ ॥
মোহভরে এ ঐশ্বর্য্য ভাবিছ আপন,

ভাবিছ অনন্তকাল;
রবে তুমি সুরপাল,
দেখিতেছ অসম্ভব সুখের স্বপন।
চিন্তিলে অতীত, চিত্ত হ'ত না এমন ॥

পৃথু, ঐল, ময়, ভীম, নরক, সম্বর
আদি কত মহাবীর দৈত্যলোকেশ্বর;
কত ইন্দ্রে খেদাড়িয়া;
স্বর্গের ঐশ্বর্য্য নিয়া
ভুঞ্জিয়াছে ; কালবশে ত্যজি কলেবর;
গেছে চলি—চিন্তা কি তা কর পুরন্দর ?
যাব আমি, যাবে তুমি,
যাবে স্বর্গ মর্ত্ত্য ভূমি,
পৃথ্বীস্বামী বহু হবে আমাদের মত।
হবে যুদ্ধ ; জয় পরাজয় হবে কত ॥
জগতের এই রীতি,
নিরীখণি নিতি নিতি,
চিত্ত মোর ক্ষোভশূন্য অসূয়াবিগত।
আছি স্থির বায়ুশূন্য সমুদ্রের মত ॥

কত রুদ্র সাধ্য বসু আদিত্য সকল;
আমার বিক্রমে তেয়াগিত রণস্থল।
তুমি ত আমার ডরে
পশি গুপ্ত গহ্বরে
কত শীত বর্ষা বায়ু সহি, ধরাতল
ভাসাইতে অধোমুখে ফেলি অশ্রুজল।

সেই আমি—কালবশে তোমার সম্মুখে,
শুনিতেছি, কহিতেছ যাহা আসে মুখে।
কিন্তু আমি তাঁর নামে,
তাঁর গুণে, তাঁর প্রেমে,
করিয়াছি এ হৃদয় এমন নির্ম্মিত,
নিন্দাস্তুতি মানামানে নহি বিচলিত।

নহি আমি আর—ক্ষুদ্র বাসনার দাস,
দেহের স্বাচ্ছন্দ্যে আর না আসে উল্লাস।
বিজয় প্রতিষ্ঠা তরে,
আর নাহি ইচ্ছা করে,
ব্রহ্মানন্দে করি আমি এ নির্জ্জনে বাস।
নিঝ'রিণী-নীরে আমি জুড়াই পিয়াস।

সংযোগে সম্বন্ধ নাই, বিয়োগের ভয়,
এ মোর অন্তরে আর কভু নাহি হয়।
আনন্দে পোহায় রাত্রি,
প্রকৃতি আনন্দদাত্রী—
কত আনন্দের মূর্ত্তি আমাকে দেখায়।
—আনন্দতরঙ্গ ঐ সিন্ধুনীরে ধায়।
আনন্দের ঘনরাজি,
আনন্দে আকাশে সাজি,
কত আনন্দের রঙ্গ অন্তরে জাগায়।
রবি চন্দ্র গ্রহ তারা
আনন্দ পরিয়া তারা
আনন্দে উদিয়া মোর সম্মুখে দাঁড়ায়।
আনন্দে পবন বহি লাগে মোর গায়।

ছিনু যবে ত্রিলোকের রাজরাজেশ্বর,
ত্রিবিধ সন্তাপে নিত্য ছিলাম জর্জ্জর।
শত্রু মিত্র মানামান,
অহঙ্কার অভিমান,
ক্রোধ, হিংসা, অজ্ঞানতা ছিল সহচর।
ছিল তুচ্ছ দেহসুখে ব্যাকুল অন্তর।
উৎক্ষিপ্ত সমুদ্র সম,
উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত মম
চিত্ত ছিল, ছিল বিশ্বগৃহ কারাগার।
বহিতাম দুশ্চিন্তার বোঝা অনিবার।

কারাগার মুক্ত আমি বিগত-বন্ধন।
বসিয়াছি পাতি নিত্যানন্দ সিংহাসন।
উত্তপ্ত দুঃখের মূল
সুন্দরী যুবতীকুল
মোহশূলে বিদ্ধ আর না করে নয়ন।
—রূপসিন্ধু ব্রহ্মচর্য্যে করি আলিঙ্গন।

আমার সম্পত্তি এবে আনন্দ কেবল,
কারো সাধ্য নাহি ভবে,
সে আনন্দ কাড়ি লবে,
ছলে কিংবা মহাযুদ্ধ করি মহাবল।
—অক্ষয় সম্পত্তি মোর এখনে সম্বল।

তিরস্কার পুরস্কার অমান সম্মান,
আমার সম্মুখে এবে সমস্ত সমান।

শত্রু, মিত্র, মধ্যস্থ বা আত্মীয়, বান্ধব,
যক্ষ, রক্ষ কিংবা দেব, গন্ধর্ব্ব, দানব,
সম্পদ বিপদ কিংবা জীবন মরণ,
সর্ব্বত্র সে এক ব্রহ্ম করি দরশন ॥

মোর ভয়ে ফিরিতেছ,
আর মনে ভাবিতেছ,
পাছে আমি আবার তোমাকে খেদাড়িয়া,
ত্রিলোকাধিপতি হই রাজদণ্ড নিয়া।
নির্ভয়ে রাজত্ব তুমি কর সুরপাল,
আর আমি নাহি যাব জড়াতে জঞ্জাল ॥”

শুনি সুরপুরেশ্বর
শান্তভাবে জুড়ি কর
প্রণমিয়া দৈত্যেশ্বরে করে সম্বোধন,
“ধন্য তুমি জ্ঞানারূঢ় শান্ত মহাজন!
তোমার বৈরাগ্য ধন্য,
সম্মান তোমার জন্য,
অদ্য হ'তে এ দেবেন্দ্র অন্তরে রহিল।
তাপসেন্দ্র তুমি, অদ্য ইন্দ্র তা জানিল।
বহু জন্ম পুণ্যফলে,
বহু তপস্যার বলে,
ভোগাশায় বিতৃষ্ণা অন্তরে উপজয়,
এ সকল তোমার পুণ্যের পরিচয়।

যে হস্তে তুলিয়া বজ্র করিয়াছি রণ,
সেই হস্ত কৃতাঞ্জলি কর দরশন।

আনন্দ-সিন্ধুর তীরে
আনন্দে বিহর ধীরে
আনন্দ-সমীরে স্নিগ্ধ কর দেহ মন।
স্বয়ং সচ্চিদানন্দ তব সঙ্গে রন।

দানব মানব কিংবা দেবতা কিন্নর,
মাত্র তপস্যার বলে হয় পূজ্যতর।
দেবতা হ'লে কি হবে,
বাসনান্ধ যদি রবে,
দ্বন্দ্ব সন্দ কলহে সে পূর্ণ নিরন্তর।
দৃষ্টান্ত উত্তম তার আমি দেবেশ্বর॥
তোমার সম্পত্তি লুণ্ঠি সাধ্য কি এখন?
বিশ্ববরণীয় তুমি, আমি ক্ষুদ্র জন।
বিশ্বনাথ তব সঙ্গে ছায়ার মতন।"
এত বলি পুরন্দর করিল গমন।
বলির বৃত্তান্ত পড়ি অন্তরে আমার,
ঐশ্বর্য্য-বিনাশে দুঃখ নাহি আসে আর।
তত্ত্বজ্ঞান বৈরাগ্যের অভাব যথায়,
মানুষ উন্মত্ত তথা ঐশ্বর্য্য-বাঞ্ছায়।
প্রাপ্ত হলে ঐশ্বর্য্য আনন্দে গর গর,
নষ্ট হ'লে ঐশ্বর্য্য কান্দিয়া মর মর!
হউক সম্রাট—একছত্রী নরপতি,
কালচক্রে করিতেছে মৃত্যুপথে গতি।
কালচক্র অনুভূত অন্তরে যাহার,
অনুভূত যার জরামৃত্যু সমাচার,
ফাঁশীর আসামী ঠাঁই সন্দেশ যেমন,
ঐশ্বর্য্যের সুখ তার নিকটে তেমন॥

কি সুখ ঐশ্বর্য্যে তাহা বুঝিবারে নারি,
যথায় ঐশ্বর্য্য তথা নিত্য দুঃখ হেরি।
নানারূপে নানাশত্রু করিয়া বেষ্টন,
ছলে বলে কৌশলে ত করয়ে লুণ্ঠন।
মধুচক্রে মধু আহরণে মধুকর,
সেই মধুলোভে তার শত্রু হয় নর।
মধুর ঐশ্বর্য্য—মধু যদি না রহিত,
লোভান্ধ মানুষ শত্রু কভু না হইত।
মোর যদি না রহিত ঐশ্বর্য্যসম্ভার,
মোর শত্রু হইতে প্রবৃত্তি হ'ত কার?
অতএব শত্রু প্রতি নাহি মোর রোষ।
—মানুষের দোষ নাই, ঐশ্বর্য্যের দোষ!
শত্রুতার মূলে ওই ঐশ্বর্য্য যখন,
ঐশ্বর্য্যের প্রতি আর নাহি মোর মন।
ঐশ্বর্য্যও নাই, আর শত্রুতাও নাই।
নির্ভয় হইয়া এবে সর্ব্বদা বেড়াই।
সদানন্দময়ী কালী তার নাম নিয়া,—
যে আনন্দে থাকি তাহা বুঝাব কি দিয়া ॥"
শুনিয়া সে ব্রাহ্মণের আত্মসম্বরণ
পূর্ণানন্দে পূর্ণ হ'ল মো সবার মন।
ভাবিলাম, তত্ত্বজ্ঞান বৈরাগ্য না হলে,
ইন্দ্রিয়ের দাস নর রহে ভূমিতলে।
যে জন ইন্দ্রিয়দাস সে বিশ্বের দাস।
সে দাসত্ব তার শান্তি নিত্য করে নাশ।
ইন্দ্রিয়ের ভৃত্য যেই,
হউক সম্রাট সেই,

পরাধীন তার তুল্য কে আছে ভূতলে।
হইয়া ভৃত্যের ভৃত্য সর্ব্বদা সে চলে।
দুর্ব্বাসনামত্ত মনে ঐশ্বর্য্য সে চায়,
—ঐশ্বর্য্যের তরে করে অসত্য অন্যায়।
না মানে ঈশ্বর, তার নাহি ধর্ম্মাচার,
অভ্যন্তরে পশু, বাহ্যে মনুষ্য আকার।

সাধুসঙ্গে, সদালাপে, তপস্যায় আর,
তত্ত্বজ্ঞান বৈরাগ্য জনমে চিত্তে যার,
মায়ার বন্ধনে মুক্ত হয় সে সুজন ;
দিব্যজ্ঞাননেত্রে করে দিব্য দরশন।

ইন্দ্রিয়ের দৃঢ় মোহ সম্মুখে তাহার,
কুয়াসার তুল্য হয় পলে পরিষ্কার।
দিব্যচক্ষে নিরখে সে জগদ্ধাত্রী মায়,
বিধান লঙ্ঘিতে বিশ্বে সাধ্য আছে কার!
কাকে কোন্ কর্ম্মফল কখন সে দিবে,
কবে কি ঘটাবে কার সাধ্য কে বুঝিবে।

নিরপেক্ষ সুবিচার,
মঙ্গল বিধান তার,
সে বিধানে সুখ দুঃখ আসে ভাগ্যোপরে।
ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় জীবে সহ্য করে।

তার রঙ্গমঞ্চ হয় এ বিশ্ব-সংসার,
রঙ্গময়ী কালী রঙ্গ করে অনিবার।
তার বিশ্ব, তার চন্দ্র, সূর্য্য, ধরাতল,
তার ক্ষেত্র, তার শস্য, তার অগ্নি জল।

তার বৃক্ষ, তার ফল ; যাকে সে যেমন
দান করে, সেই ভোগ করে তা তেমন।
তার বাড়ী, তার ঘর, আমরা তাহায়
রাত্রির অতিথি, সেই খাওয়ায় শোয়ায়।
তত্ত্বদর্শী সাধক বুঝিয়া সমুদয়,
এ ভবের সুখদুঃখে বিচলিত নয়।
জগদ্ধাত্রী পদে মন বান্ধা থাকে যার,
সম্পত্তি বিনাশে চিত্তে নাহি ক্ষোভ তার।
যিনি বিশ্বপ্রভু, মোরা নিত্যদাস তার,
দাসের কর্ত্তব্য সেবা ভক্তি অনিবার।
স্বকৃপায় সুখ দুঃখ প্রভু যাহা দিবে,
প্রভুদত্ত বলি তাহা মাথায় ধরিবে।
হেন আনুগত্য মনে আসিবে যে দিন,
সে দিন সে প্রভু হবে স্নেহের অধীন।
তাঁহার ইচ্ছায় চলে এ তিন ভুবন,
তোমার ইচ্ছায় তিনি চলেন তখন।
ভক্তি সাধনার এই রহস্য প্রধান,
অনুভবে সমর্থ কেবল ভক্তিমান।
ভক্তের অন্তরে নাই কর্ত্তৃত্বাভিমান।
লাভালাভে জয়াজয়ে ভক্ত সমজ্ঞান।
ভগবতী ইচ্ছা বলি যাহা ঘটে তায়,
ভক্তের অন্তরে শান্তি সর্ব্বদা খেলায়।
হরিদাস ঠাকুরের মতন তখন,
কহে ভক্ত, "থাক্ সুখে ভবে সর্ব্বজন।
সকলের দুঃখ প্রভো মোরে কর দান,
করুক সকল জীব সুখে অবস্থান।"

আনিতে হয় না ধৈর্য্য করি অন্বেষণ;
ভক্তিপথে চলে ধৈর্য্য ভৃত্যের মতন।
জগদ্ধাত্রী কালীনামে রুচি জন্মে যার,
জপভরি শক্তিতত্ত্ব উপলব্ধি তার।
সর্ব্বভূতে আত্মানন্দ করি দরশন;
শত্রু মিত্র বুদ্ধিশূন্য নিত্য তার মন।
শান্তি-সরোবরে নৌকা বাহি সে বেড়ায়,
ঐশ্বর্য্য বিনাশে তার কিবা আসে যায়।
সম্মুখে উন্মুক্ত তার শান্তির দুয়ার,
হায় কবে সে অবস্থা হবে ভুলুয়ার॥

শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী।

ষষ্ঠ দিন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ১

শ্রীশ্রীচণ্ডী।

"জয়কালী জয়কালী জয় বিশ্বনাথ, (২)
জয় বিশ্বনাথ, জয় পশুপতিনাথ।
জয় পশুপতিনাথ, জয় উমানাথ,

১। যিনি সর্ব্বজীবে ভ্রান্তিরূপে সংস্থিতা আছেন বার বার তাঁহাকে নমস্কার করি।

২। বিশ্বনাথ কাশীধামে; পশুপতিনাথ নেপালে; উমানাথ বা উমানন্দ কামাখ্যায়; মহাকালনাথ ভোটানে; চন্দ্রনাথ চট্টগ্রামে; উনকোটীনাথ দক্ষিণ শ্রীহট্টে; আদিনাথ বঙ্গোপসাগরে; জগন্নাথ পুরীতে; রামেশ্বরনাথ মান্দ্রাজে; কেদারনাথ বদরীনারায়ণের পথে; অমরনাথ কাশ্মীরে; ওঙ্কারনাথ নর্ম্মদাগর্ভে ইন্দোরে।

জয় উমানাথ, জয় মহাকালনাথ।
জয় মহাকালনাথ, জয় চন্দ্রনাথ,
জয় চন্দ্রনাথ, জয় উনকোটীনাথ।
জয় উনকোটীনাথ, জয় আদিনাথ,
জয় আদিনাথ, জয় দেব জগন্নাথ,
জয় জগন্নাথ, জয় রামেশ্বরনাথ,
রামেশ্বরনাথ জয় শ্রীকেদারনাথ।
জয় শ্রীকেদারনাথ, শ্রীঅমরনাথ,
জয় শ্রীঅমরনাথ, শ্রীওঙ্কারনাথ।
যথা শক্তি তথা শিব পরমকারণ,
শিবশক্তি ভুলুয়ার জীবন জীবন ॥”
(নাম সঙ্কীর্ত্তন।)

কহে বৃদ্ধ রত্নগিরি, “ ধৈর্য্য যদি ধরি,
অনেক সময় বৃথা গঞ্জনায় মরি।
দুর্ম্মতি দুর্জ্জন যারা,
নির্ভয় হইয়া তারা,
আমার যা ক্ষেত্র খোত্র হ’রে খায় মাস,
আমি ধৈর্য্য ধরিলে, তাদের মহোল্লাস।
যাহা কিছু উপার্জ্জন,
কাড়ি নিলে দস্যুগণ,
কি দিয়া করিব রক্ষা পুত্র পরিজন,
কি দিয়া বা করি সাধু সজ্জন সেবন।
কিন্তু যদি দণ্ড ধরি,
প্রতিহিংসা সার করি,
দুর্জ্জন ধরিয়া সদা করি নির্য্যাতন,
শঙ্কায় তাহারা দূরে করে পলায়ন।

না হইলে নিত্য ক্ষমা দুর্জ্জনে করিলে,
শান্তি সুখ অন্তর্হিত হয় মহীতলে।
অনিষ্টকারীর প্রতিহিংসায় কি দোষ?
বিষ্ণুও নাশেন বৈরী করি মহারোষ।”
উত্তরে সন্তান, “যারা নির্ভরবিহীন,
আপনাকে কর্ত্তা বলি ভাবে নিশিদিন,
দুর্জ্জন শাসন তরে,
তারা সদা দণ্ড ধরে,
কেহ মারে, কেহ মরে, যা হওয়ার হয়;
মারামারি নিয়া তারা আমরণ রয়।
হিংসায় হিংসার মাঠে,
নিত্য প্রতিধ্বনি উঠে,
হিংসায় হিংসার শেষ কভু নাহি হয়;
হিংসার প্রান্তরে ধ্বংস করে অভিনয়।
হেন প্রতিহিংসা পুষি অন্তরে সতত,
দুর্লভ জনমে কোন্ লক্ষ্য সুসাধিত?
রাজসিক নরে কার্য্য করে এ প্রকার,
স্বভাবে করায় কার্য্য, কি দোষ কাহার!
বিষ্ণু সত্ত্ব গুণময় দেখি সর্ব্ব ঠাঁই,
হিংসা প্রতিহিংসা তাঁর কার্য্যে কভু নাই।

তথা শ্রীশ্রীগীতায়—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥ ১

১। আমি সর্ব্বভূতে সমান; আমার শত্রু মিত্র কেহ নাই; যারা আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজন করেন, তাঁহারা আমাতে এবং আমি তাঁহাদিগে বর্ত্তমান থাকি।

তবে সেই জগন্নাথ রাজরাজেশ্বর,
কর্ম্মফলদাতা তিনি বিভু সর্ব্বোপর।
তিনি যদি দণ্ডদাতা,
তিনি সর্ব্বজীব প্রাতা,
তবে মোরা দুষ্টে সাজা কেন দিতে যাই!
ধৃষ্টতার দোষ কেন মস্তকে জড়াই?
সাত্ত্বিক সাধক যারা বশিষ্ঠ সমান
সবের সম ক্ষমাময় মনস্বী মহান।
সাধকের ধর্ম্ম যাহা,
হিংসাশূন্য ক্ষমা তাহা,
—অমৃত সমান অমরত্ব করে দান।—
—দুর্জ্জন শাসনে সাধু প্রেম নিয়া যান!!

পুনঃ দৃষ্টি কর ভদ্র সুস্থির হইয়া
দুর্জ্জন শাসন তরে
কালী মহাখড়্গ করে,
প্রলয়ের মূর্ত্তি ধরি আছে দাঁড়াইয়া।
দেখিতেছে কে দুর্জ্জন ত্রিনেত্র মেলিয়া।
রাজরাজেশ্বরী কালী,
হয় আজ নয় কালি,
হানিবে দুর্জ্জয় খড়্গ দুর্জ্জনে ধরিয়া।
সাধ্য কি তখন তার, বাঁচে পলাইয়া!
সৃজন করিয়া তোমা আনিয়া সংসারে,
বসাইল যথাযোগ্য দ্রব্য চারি ধারে।
ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব্বে বক্ষে জননীর,
যে করুণা করি অগ্রে রাখি দিল ক্ষীর,

আছে কি সে উদাসীনা তোমার রক্ষায়,
যে সর্ব্বদর্শিনী সে কি দর্শে না তোমায় ?
যাঁহার বিধানে ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদিত,
কাটিয়া লইয়া গৃহে কর রাশীকৃত,
যাঁহার বিধানে গঙ্গা যোগায় সলিল ;
—রক্ষা করে প্রাণ আসি নির্ম্মল অনিল,
প্রতিক্ষণ রক্ষি প্রাণ যাঁর করুণায়,
দুর্জ্জনের করে সে কি রক্ষে না তোমায় ?
অনিষ্ট ঘটিলে, চিন্ত আপন হিয়ায়,—
সর্ব্বদা কি প্রতিহিংসা নিতে পারা যায় ?
দুষ্টে দ্রব্য নিলে প্রতিহিংসা লও তার,
আগুনে পুড়িলে গৃহ হিংসা কর কার ?
ভূমিকম্পে ধ্বংস হল টোকিও সহর,
প্রতিহিংসা লবে কোথা জাপানী বহর।
পঞ্চ শক্তি একত্রে করিল মহারণ,
নিকোলাসে কৈল হত্যা তার নিজ জন।
যুদ্ধে যোগ দিয়াছিল আত্মরক্ষা তরে,
দৈবের কি বিড়ম্বনা আত্মঘাতে মরে।
বন্ধুবর্গ কেহ তার না হল সহায়,
কর্ম্মফল সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্র ধরায়।

১৩৩০ সালে ৪ঠা ভাদ্র ভূমিকম্পে জাপান রাজধানী টোকিও নগর ধ্বংস হয়। যদি অন্য কোন প্রবল শক্তি জাপান আক্রমণ করিত, জাপানের দুর্জ্জয় রণতরির বহর প্রতিহিংসায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া শত্রুর কত যুদ্ধ জাহাজ সমুদ্র গর্ভে ডুবাইয়া দিত, কত জীবন সিমোজা পাউডারে উড়াইয়া দিত। কিন্তু ভূমিকম্পে যে অনিষ্ট সাধিত হইল, তাহার জন্য কোথায় প্রতিহিংসা লইতে পারিল। ইষ্টানিষ্ট লোকে মাত্র নিমিত্ত হইয়া করে—যথার্থ কর্ত্তা সেই কর্ম্মফলদাতা ভগবান।

কর্ম্মফলদাত্রী সেই জগদ্ধাত্রী কালী,
জানি পাদপদ্ম বুকে ধরে চন্দ্রভালী ॥

তাই বলি মোদের কর্ত্তৃত্ব কিছু নাই—
কর্ম্ম যার যেমন, তেমন ফল পাই।
দুর্জ্জন নিমিত্ত, কার প্রতিহিংসা লব,
যথার্থ যে দুঃখদাতা কোথা তাকে পাব!
তাঁহারি কৃপায় শক্তি লাভ করে নরে,
সে শক্তির অপব্যবহার করে পরে।
নিজ নিজ কর্ম্মফল তারপরে পায়,
নিজ কর্ম্ম না বিচারি অন্যকে দোষায়।

কিন্তু ক্ষমাময় চিত্ত যে জন মহীতে,
কারো সাধ্য নাহি তার অনিষ্ট করিতে।
অনিষ্ট করিলে তার ইষ্ট তাহে হয়,
রটে কীর্ত্তি জগভরি অমর অক্ষয়।

প্রতিহিংসা শত্রুর কতই কে বা লবে,
শত্রুছাড়া কোন্ জন্ আছে এই ভবে!
রাজা হও প্রজা হও শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট—
আপনি জুটিবে শত্রু করিতে অনিষ্ট।
সমগ্র পৃথিবী যদি কর অন্বেষণ,
নিঃশত্রু জীবন নাহি পাবে একজন।

অবতার বলি যাঁরা অর্চ্চিত ধরায়,
কত শত্রু তাঁহাদের পাছে পাছে ধায়।
ক্ষমাময় বশিষ্ঠের শত্রু বিশ্বামিত্র,
—শিষ্য যদি হ'ল শত্রু কেবা হবে মিত্র।
দ্রোণ-বধ-নিমিত্ত অর্জ্জুন মহাবীর,
ভীষ্মবধে উদ্যোগী স্বয়ং যুধিষ্ঠির।

ছাড়িয়া পূর্ব্বের কথা বর্ত্তমানে আসি,
দেখি মহাপুরুষের শত্রু রাশি রাশি।
যীশুখৃষ্ট ক্রুশে বিদ্ধ শত্রুর বিচারে,
হরিদাস রজ্জুবদ্ধ বাইশ বাজারে।
সক্রেটিশ তীব্র বিষ পানে হীনপ্রাণ,
সাধুর অধিক শত্রু ভবে বিদ্যমান।
কিন্তু তাঁরা তা বলিয়া ক্রোধমত্ত চিত্তে,
অগ্রসর নাহি হন প্রতিহিংসা ল'তে।
ক্ষমায় তাঁহারা বিশ্বে অবতার বলি,
প্রাপ্ত হন নিত্য নব শ্রদ্ধার অঞ্জলি।
দুষ্ট যে, আপনি কষ্ট পায় সর্ব্বক্ষণ,
আনে কাল তার জন্য তীব্র নির্য্যাতন।
তার প্রতিহিংসা নিতে দাঁড়াব কি জন্য,
মনুষ্যত্ব লভি কেন হইব জঘন্য!
দুর্জ্জনের সঙ্গে যদি ছাড় অনুবন্ধ,
তাহাতেই হবে তার সর্ব্বদিক বন্ধ।
সাহায্যবিহীন হলে আপনি মরিবে,
হিংসার জঞ্জাল কেন নিজে সিরজিবে?
পরহিংসা পরিত্যাগ যে জন করেছে,
মহৎ সে, এ কথায় সন্দেহ কি আছে!
মহতের মর্য্যাদা লঙ্ঘন যারা করে,
ভাগবত বাক্যে তারা সর্ব্বরূপে মরে।

তথা শ্রীশ্রীভাগবতে :—

আয়ুঃ শ্রীয়ঃ যশোধর্ম্ম লোকানাশীষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসঃ মহদতিক্রম॥ (১)

(১) যে ব্যক্তি মহতের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে, তাহার আয়ু ক্ষয় হয়, লক্ষ্মীশ্রী নষ্ট হয়, যশ নষ্ট হয়, ধর্ম্ম নষ্ট হয়, গুরুগণের আশীর্ব্বাদ নষ্ট হয় এবং তাহার সর্ব্ব প্রকার মঙ্গল নষ্ট হয়।

বলেন আভীরানন্দ, "দুর্জ্জন যে জন,
উপযুক্ত দণ্ড তাকে নিত্য প্রয়োজন।
দণ্ড বিনা দুর্জ্জনে কি হিত পথে চলে!
ক্ষমায় কেবল তারা যন্ত্রণা উছলে।
সাত্ত্বিক সন্ন্যাসী যারা তাহাদের ধারা,
গৃহস্থে ধরিলে যাবে ধনে প্রাণে মারা।"
উত্তরে সন্তান, "যাঁরা আদর্শ সাধক,
সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে তাঁরা অহিংসক।
তাঁহাদের ধর্ম্ম যাহা তাই বলিতেছি।
লক্ষ্য উচ্চ কর, ইথে তর্ক মিছামিছি।
কর্ম্মফলদাতা যদি হন ভগবান,
তিনি দণ্ড না দিলে কে করে দণ্ড দান!
লোকে দণ্ড যাহা করে, তাহাও তাঁহার,
দৈব-দণ্ড ঘটিলে বিশ্বাস মো সবার!"
সুধান আভীরানন্দ, "দুর্জ্জন পামরে,
লোকে না দণ্ডিলে দৈব দণ্ড দান করে।
আছে কি কোথাও তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ?"
উত্তরে সন্তান, "ঘরে ঘরে বিদ্যমান!
সর্ব্বত্র যাঁহার দৃষ্টি সদা বিদ্যমান,
অজ্ঞাত কি তাঁর তাহা কহ বুদ্ধিমান।
কার সাধ্য এড়াইবে তাঁহার বিচার,
দৈব যাকে বল, তা ত কৃপাণ তাঁহার।
সে কৃপাণ কাটে সন্তানের মোহপাশ,
কাটে মুণ্ড দুর্জ্জনের করি সর্ব্বনাশ।
ভ্রমে সে কৃপাণ কত শত রূপ ধরি,
বিচারিলে বিস্ময় সাগরে ডুবে মরি।

কভু ভূমিকম্প, কভু ভীম প্রভঞ্জন,
কভু ঘূর্ণিবায়ু, কভু ভীষণ প্লাবন।
কভু বজ্রপাতরূপে, কভু সংক্রামক
ব্যাধিরূপে, সে দুর্জ্জয় কৃপাণ নাশক।
কতরূপে তাঁর খড়গ ঘুরে মহীতলে,
চিন্তিলে শঙ্কায় প্রাণ কাঁপে বক্ষতলে।
ঘুরিছে ভীষণ খড়গ মাথার উপরে,
তবু কি আশ্চর্য্য কেহ দর্শন না করে।
উত্থিত খড়েগর নিম্নে বসতি সদাই।
কবে কার স্কন্ধে পড়ে কিছু ঠিক নাই।
তবু জীব "আমি কর্ত্তা" বলে বার বার,
—ধন্যা বিষ্ণুমায়ে! তোমা করি নমস্কার॥
দুটী বা একটী নয়, কোটী কোটী তাঁর,
তনয় লইয়া অভিনয়ের সংসার।
অগণ্য তনয় রক্ষা সহজ ত নয়,
তাই মায়াজালে বাঁধি রাখে সমুদয়।
বুদ্ধিরূপা কালী যাকে যে ভাবে মারিবে,
সেইভাবে বুদ্ধি দিয়া মশানে আনিবে।
—সর্ব্বত্র মশান তাঁর, সর্ব্বত্র শ্মশান।
সর্ব্বত্র নিরথ তাঁর বিচারের স্থান।
সর্ব্বত্র বিরাজে তাঁর আজ্ঞাবাহী চর,
তাঁর দণ্ডাদেশ বহি ফিরে নিরন্তর।
তাঁহার বিচার ফল পাই হাতে হাতে,
মারিতে যাইয়া তাই মরে অপঘাতে।
নির্দ্দোষ শিশুর প্রাণ বধিতে যাইয়া,
মরে বোনা তাই শিরে মুদ্গর খাইয়া।

বলেন আভীরানন্দ, "কহ বিস্তারিয়া।"
বলিল সন্তান, যাহে শিহরয়ে হিয়া।
"গোস্বামী গোকুলচন্দ্র বাড়ী ভাতগায়,
গ্রামে গ্রামে ভাগবত পড়িয়া বেড়ায়।
পত্নী তার বৃন্দারাণী,
রূপের বাজারে রাণী,
বয়সে চব্বিশ ; আছে এক পুত্র তায়,
চারি বৎসরের শিশু রূপে ইন্দু প্রায়।

গোস্বামীর ঘরে আছে বৃদ্ধা মাতা তার,
বাড়ীর চৌদিকে আছে প্রাচীর, প্রাকার।
প্রাচীরের মধ্যে গৃহ ছোনের ছাউনী,
লৌহমঞ্চ মধ্যে যেন লতার বাউনী।
বাড়ীর নিকটে বাস করে মুসলমান,
নিরক্ষর কৃষক সে, প্রৌঢ়া বলবান।
স্বভাবে সে সচ্চরিত্র, ঈশ্বরে বিশ্বাসী।
সজ্জন বলিয়া ভালবাসে গ্রামবাসী।
ক্ষেত্র চষি নিজ ধান্য নিজে অর্জ্জি খায়,
কোনরূপে দুঃখ কষ্টে সংসার চালায়।
গোঁসাই তাহাকে কিছু টাকা কর্জ্জ দিয়া,
দুই বন্দ জমী তার নিল ঠকাইয়া।
দরিদ্র কৃষক, অর্থ বল নাহি তার,
আদালতে আবেদনে রুদ্ধ তার দ্বার।
গোঁসাইকে স্তুতি নতি অনেক করিল,
কৃপণের প্রাণে তবু দয়া না আসিল!

গোকুল জাতীতে সংযমী বৈষ্ণব। নাম গোকুলবিহারী দাস। ভাগবত পড়ে বলিয়া গোস্বামী উপাধি। তার ছোট ভাই এল, এম, এস ডাক্তার।

ক্ষেত্র হারাইয়া দুঃখী অকূলে পড়িল
মনোকষ্টে কিছুকাল কান্দিয়া ফিরিল।
অন্নাভাবে কৃষকের পুত্র পরিজন—
—মধ্যে বহে দুঃখের তরঙ্গ অনুক্ষণ।
গত্যন্তর না দেখিয়া কৃষক তখন,
মনে মনে বলে, "থাক্ পাষণ্ড কৃপণ,
যখন যাইবি তুই প্রবাসে আবার,
পোড়াইয়া তোর বাড়ী বনাইব ক্ষার।
দুঃখ কাকে বলে তোকে দেখাব এবার,
শত্রু তুই তোর নাশে কি পাপ আমার!"

এত ভাবি কৃষক সঙ্কল্প করি স্থির,
রহিল উত্তপ্ত মনে,
সর্প যথা লেলিহনে—
দংশনের কিছু পূর্ব্বে, অথবা হস্তীর
আক্রমণ পূর্ব্বে যথা নিস্পন্দ শরীর॥
গোপনে কৃষক সদা করে অন্বেষণ,
গোঁসাই কখন করে প্রবাসে গমন।
আসিল বৈশাখ মাস, গোঁসাই তখন
পাইল সুদূরে এক পাঠে নিমন্ত্রণ।
আনন্দে অধীর হ'ল,
ভাগবত স্কন্ধে নিল,
বাহিরিল প্রায় দুই মাসের মতন,
পাছে আসি পত্নী করে প্রেমের রোদন।
"প্রবাসে চলিছ তুমি,
ইথে কি বলিব আমি,

না গেলে সংসার চলা কঠিন এখন ;
অসহ্য আমার পক্ষে তব অদর্শন।
দণ্ডের বিরহ আমি সহিতে না পারি,
কি কহিব, দিনে ঘোর আঁধার নেহারি।"

পত্নীর প্রণয় হেরি সজল নয়নে,
গোঁসাই সান্ত্বনা করে মধুর বচনে।
"কাঁদিও না, যাত্রাকালে স্মরি কান্দা মুখ,
জাগাইবে পরবাসে চিত্তে মহা দুখ।
তোমার সেবার জন্য অন্নবস্ত্র চাই,
অন্নবস্ত্র সংগ্রহিতে পরবাসে যাই।
পরবাসে কষ্ট সহি,
তোমারি নিমিত্ত রহি,
তোমারি নিমিত্ত করিয়াছি বাড়ী ঘর,
তোমা সন্তোষিতে সদা ব্যাকুল অন্তর।
মুখে কৃষ্ণনাম করি,
অন্তরে তোমায় স্মরি,
তোমা ভিন্ন অন্য নাহি জানে মোর হিয়া,
দু' মাসের মধ্যে আমি আসিব ফিরিয়া।"

বাহিরিল গোঁসাই পড়িতে ভাগবত,
কৃষক পাইল হিংসা সাধিবার পথ।
অন্ধকার রাত্রিকাল,
থাকি থাকি ফেরুপাল,
ডাকে মাঠে ; ডাক শুনি গ্রামের কুকুর
চিৎকারে, ছাড়িয়া বাড়ী, আসি কিছু দূর।

নিস্তব্ধ নিদ্রায় সর্ব্বগ্রামে সর্ব্বজন।
—কর্ম্মবীর শ্রান্তি নাশে বিলুপ্ত চেতন।
মুসলমান মনে চিন্তি এখনি সময়,
লঙ্ঘিল প্রাচীর, ক্রোধে নির্ভয় হৃদয়!
কিন্তু গৃহপার্শ্বে আসি নিরীক্ষণ করে,
কক্ষ আলোকিত, দীপ প্রজ্জ্বলিত ঘরে।

গোস্বামীর পত্নী যেন কাহার সহিত,
করিছে মধুরালাপ হরষিত চিত।
কৃষক সহসা মনে বিস্ময় মানিল,
ভাবিল, গোঁসাই ঘরে ফিরি কি আসিল!
গবাক্ষের নিকটে হইল অগ্রসর,
দেখিল চণ্ডাল বোনা শয্যার উপর।
শুইয়া কহিছে কথা, বৃন্দা তার গায়
পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হাওয়া করিছে পাখায়।
দেখি দৃশ্য কৃষকের তনু শিহরিল,
"হা ধর্ম্ম!" বলিয়া ধীরে নিশ্বাস ফেলিল।
শুনিল, কহিছে বোনা, "শুন ঠাকুরাণী!
তোমার এ পুত্রটাকে নহে ভাল জানি।
হাজার হলেও ভদ্র লোকের সন্তান,
চারিবর্ষে মোর চেয়ে ওর বেশী জ্ঞান।
তুমি যত যত্ন কর, সন্দেহে আমার
প্রাণ তত কাঁপে, ওর ভয়ে অনিবার।
ছেলেটাকে দেখি যেন যমের সমান,
কিছুতেই স্থির নাহি রয় মন প্রাণ,
ও যদি সহসা কথা করয়ে প্রকাশ,
তা'হলে কঠিন হবে মোর গ্রামে বাস।
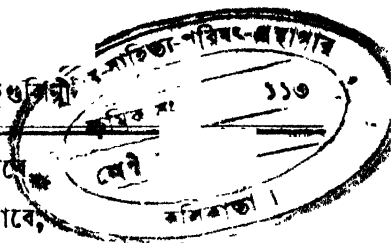
বাস দূরে প্রাণ যাবে,
তব প্রেমে না কুলাবে,
তাই বলি পুত্রটাকে হয় বধ কর
না হয় আমার ভালবাসা পরিহর!"

বৃন্দা কহে, "ও কি বুঝে, ও শিশু সামান্য,
কি আশ্চর্য্য এত ভয় কর ওর জন্য!
প্রাণ-প্রিয়তম তুমি, আসিলে গোঁসাই,
শপথি কহিনু তব কোন চিন্তা নাই;
নিন্দিলেও লোকে, তোমা কিছু বলিবে না,
পুরুষ-ভুলানো মন্ত্র আছে মোর জানা।"
চণ্ডাল কহিল, "তুমি কি বুঝাও কারে,
নাহি দুগ্ধ পান করি বিষের আধারে।
বনের মহিষ হ'ক যত বলবান,
পলায় সে নিরখিলে সিংহের সন্তান।
ও নহে সামান্য শত্রু, ভ্রান্তি পরিহর,
মোকে যদি চাও তবে ওকে বধ কর।
মরিলে ও রবে তুমি একা এই ঘরে,
দিবসে নিশায় আমি নির্ভয় অন্তরে,
আসিব তোমার কাছে,
খাওয়াইও দুধে মাছে,
ভালবাসা দেখাইও, আমিও দেখাব,
তখন এ খাটে শুয়ে খাঁটি সুখ পাব।"
বৃন্দা ধীরে কহে, "পুত্রে বধি কি প্রকারে!"
কহিল চণ্ডাল, "নিয়া চল ঢেকী ঘরে।
ঢেকীর মোনাই তথা আছে দেখিয়াছি,
সরাইয়া দুয়ারে রাখিয়া আসিয়াছি।

আস্তে তুমি পুত্রটাকে রেখো শোয়াইয়া,
আমি সে মোনাই ধরি,
দিব মাথা চূর্ণ করি,
—চূর্ণ করি দিব মাত্র এক বাড়ি দিয়া,
আমি শেষে নিয়া দিব গাঙ্গে ফেলাইয়া।
তুমি মাত্র রক্তটুক ধুবে জল দিয়া
মুছিবে আপন হাতে মার্জ্জনা করিয়া।
তারপরে গ্রাম্যলোকে জিজ্ঞাসা করিলে,
কহিও, "সে কোথা গেছে কাল সন্ধ্যাকালে,
না পাইনু সারা গ্রাম তলাস করিয়া,
কহিও সে কথা কিছু কান্দিয়া কান্দিয়া।"
বৃন্দা সে চণ্ডাল বাক্যে সম্মতা হইল,
ঘুমন্ত সন্তানে ধীরে বক্ষে উঠাইল।
দেখিয়া সে মুসলমান,
হারাইল আত্মজ্ঞান,
অসহায় দুর্ব্বল শিশুর রক্ষা তরে,
অবিলম্বে দ্রুতপদে গেল ঢেকী ঘরে।
দ্বারদেশে মোনাই দেখিয়া হাতে নিল,
বেড়ার আড়ালে বীর দাঁড়ায়ে রহিল।
বৃন্দা পুত্রে করি কোলে,
ধীরে ধীরে অগ্রে চলে,
চণ্ডাল চলিছে পাছে নিঃসন্দেহ প্রাণ ;
সময় বুঝিয়া মহাবল মুসলমান,
পাষণ্ডের মাথায় মারিয়া এক বাড়ি—
চূর্ণ করি, প্রাচীর লঙ্ঘিয়া গেল বাড়ী।
একাঘাতে হত-প্রাণ,
অধর্ম্মের অবসান,

অন্ধকারে রক্তস্রোতে ভাসিল উঠান।
দেখিয়া বৃন্দার প্রায় ওষ্ঠাগত প্রাণ ॥
দ্রুতপদে গেল ঘরে,
পড়িল পালঙ্কোপরে,
বহুক্ষণ পাপিনীর না রহিল জ্ঞান,
বুকে বজ্রাঘাত, চক্ষে বহ্নি বহমান।
প্রলয়ের প্রভঞ্জন বহিল মাথায়,
অঙ্গে কাল-ভুজঙ্গমে বেষ্টিল তাহায়।
কি যন্ত্রণা তাহার, তা সেই মাত্র জানে,
সাধ্য নাই সে বীভৎস দৃশ্য বরণনে।
আশ্চর্য্য দৈবের খেলা;
আশ্চর্য্য কালীর লীলা!
আশ্চর্য্য প্রকারে তার আশ্চর্য্য বিচার,
আশ্চর্য্য সে খড়গ, তার আশ্চর্য্য প্রহার।
তারপরে দুর্ভাগিনী ভাবিল বসিয়া,
"গোঁসাই আসিয়া গেল সংহার করিয়া,
সে ভিন্ন এ অন্ধকারে
আর কে আসিতে পারে!
নিষ্ঠুর হৃদয় তার, ক্ষমা নাহি জানে,
আমাকেও এইরূপে বধিবে পরাণে।
বোনা মোর প্রাণ, তা সে নিশ্চয় জানিত;
দুর্নামের ভয়ে মুখে কিছু না বলিত।
প্রবাসে চলিনু বলি বাহির হইয়া,
দেখিত আমার কার্য্য গোপনে আসিয়া।
আজ আসি অন্ধকারে দেখিল সকল,
আমার বন্ধুত্ব তার চক্ষে হলাহল।

জীবনের বন্ধু আমি করিলাম যায়,
সন্দেহ করিয়া মোরে,
প্রাণে সংহারিল তারে,
মুখের সোহাগে মাত্র ভুলায় আমায়,
পাপিষ্ঠ তাহার মত সংসারে কোথায় !”

প্রভাতে গ্রামের লোক আসিল ধাইয়া,
আসিল পুলিশ পঙ্গপাল সঙ্গে নিয়া।
বৃন্দা কহে, “রাত্রে আসি বাড়ীর গোঁসাই
হত্যা করি গেল চলি, অন্য সাক্ষী নাই।”
বোনার আত্মীয় যারা,
উঠি পড়ি লাগে তারা,
গোঁসাইকে গেরেপ্তারে উন্মত্ত হৃদয়।
—মুসলমান, মধ্যে বসি শুনে সমুদয়।
ভাল মন্দ কাহাকেও কিছু নাহি কহে,
সংসার-চরিত্র হেরি-নতশিরে রহে।

যে গ্রামে গোঁসাই ভাগবত পাঠ করে ;
পুলিশ সেখানে গেল,
দুহাতে শৃঙ্খল দিল,
খুনের আসামী বলি ধরিল তাহারে,
দেখিয়া শুনিয়া ভয়ে কেহ না ফুকারে।
কেহ না করিল তার পক্ষ সমর্থন,
উদাসীন তুল্য র'ল ভক্ত শিষ্যগণ।
চারিদিকে হুলস্থূল সমালোচনার,
সে যে আলোচনা, আদি অন্ত নাহি তার !

কেহ বলে, দেখ ভাই ভাগবত পড়ে,
সেও কি নৃশংস-মতি, নরহত্যা করে।
কেহ বলে ভাল লোক আগে ভাবিতাম,
এত ভয়ঙ্কর তা ত এবে জানিলাম।
কেহ বলে গোঁসাই বৈষ্ণব যত জন,
খুনের আসামী ছাড়া আছে কোন জন ?
কেহ বলে এমন লোকের এই কর্ম্ম,
কাজ নাই করি আর ভাগবত-ধর্ম্ম।
কেহ বলে গোঁসাই বৈষ্ণব যে দেখিবে,
সেই আগে ঘাড় ধরি তাকে তাড়াইবে।
এইরূপে কতজনে কত কথা বলে,
দারোগা গোঁসাই ধরি মহোল্লাসে চলে।
নির্দ্দোষ গোঁসাই দেখি অঘট-ঘটন,
চলিল নীরবে অশ্রু করি বরষণ।

হাজতে বসিয়া শুনে দারোগার কাছে
চণ্ডাল বোমাকে সেই হত্যা করিয়াছে।
প্রিয়তমা পত্নী তার,
দেখা সাক্ষী সে হত্যার,
আর অন্য সাক্ষী নাই ; মুদগর প্রহারে,
হত্যা করিয়াছে তাকে ঘোর অন্ধকারে।
স্বচক্ষে সে দেখিয়াছে, তার সাক্ষ্য বলে,
খুনী সে ; গারদে বদ্ধ লোহার শৃঙ্খলে।

শুনিয়া নিশ্বাস ফেলি গোঁসাই ভাবিল,
"হ'ল কি এমনি ঝড় সূর্য্য খসি প'ল !
চন্দ্র কি বৃষ্টির জলে,
খসিয়াছে ধরাতলে !

নক্ষত্রে কি হল শেষে নারিকেল ফুল !
ঘটিল কি গ্রহকুলে গগনে দিক্ ভুল ?
বৃন্দা দেখিয়াছে হত্যা করিতে আমায়,
ডুবেছে কি হিমালয় বিলের বন্যায় !
এ কি স্বপ্ন কিম্বা ইহা কবির কল্পনা !
উন্মাদ কি আমি ? কিছু বুঝিতে পারি না !'
দণ্ডের বিরহ মোর সহিতে যে নারে,
মোর জন্য ধরে প্রাণ যে সতী সংসারে,
সেই সাক্ষ্য দিয়া মোকে পরাল শৃঙ্খল,
প্রাণদণ্ড তরে সেই প্রমাণ কেবল !
কি দোষ করিনু আমি তাহার সম্মুখে,
কি দোষে হানিল শূল সে আমার বুকে !
ভাবিতাম সাবিত্রী সমান সে আমার,
—সাবিত্রী পতির প্রাণ-দাত্রী অনিবার !
ধর্ম্ম কি উলটি গেল,
শাস্ত্র কি বিরুদ্ধ হল,
সাবিত্রী কি করে এবে পতিকে সংহার !
বুঝিলাম যথার্থ নরক এ সংসার !!
প্রতিমা করিয়া যারে হৃদয় মন্দিরে,
অর্চ্চিতেছি সাজাইয়া বস্ত্র অলঙ্কারে,
পরমার্থ ভুলি প্রাণ বিকাইনু যায়,
নিরখিল সেই হত্যা করিতে আমায় !”

ভাবে আর উন্মাদের মত শুধু চায়
আর সদা অশ্রুধারে ধরণী ভাসায়।
সর্ব্বাঙ্গ শৃঙ্খলাবদ্ধ, শৃঙ্খলের ভার
মরণ অপেক্ষা ক্রমে অসহ্য তাহার।

যথাকালে গোঁসাই আনিত আদালতে,
আসিল সে বৃন্দারাণী সত্য সাক্ষ্য দিতে।
একবার মুখ তুলি দেখিল গোঁসাই
দেখিল সে বৃন্দা যেন আর তার নাই।
রত্নহার, যত্নে যাহা বক্ষে পরেছিল,
হার নহে, সর্পি তাহা পরখি দেখিল।
চমকি উঠিল চিত্ত; কহিল শিহরি,
"কি ভ্রান্তি! পরিনু হার ভুজঙ্গিনী ধরি!"
বৃন্তচ্যুত ফল যথা
—কোথা বৃন্ত, ফল কোথা!—
তথা বৃন্দা দাঁড়াইল সম্মুখে তাহার,
শত চক্ষু তার পানে, দৃশ্য চমৎকার।
কহিল, "এই সে স্বামী,
স্বচক্ষে দেখেছি আমি,
হত্যা করি অন্ধকারে গেল পলাইয়া।"
নিঃশব্দ সে আদালত গৃহ তা শুনিয়া॥

হত্যাকারী মুসলমান শুনি দাঁড়াইয়া,
কহিল, "হা ঈশ্বর! কি গিয়াছ মরিয়া!"
মোকদ্দমা দায়রায় তখন উঠিল
বোনার কুটুম্ব যত উল্লাসে মাতিল।
গোঁসাই নির্ব্বাক, নাহি তদন্ত তাহার,
নাহি তার অনুকূলে কোন সাক্ষী আর।
জজ্ তাকে যত প্রশ্ন জিজ্ঞাসে, সে ধীরে,
দাঁড়াইয়া নতশিরে ভাসে আঁখি-নীরে।
আর ভাবে, "কবে হবে বিচারের শেষ,
কবে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলি ছাড়িব এ দেশ।

দেখিলাম এ সংসারে বিচার কেমন,
কেমন সে পরলোক দেখিব কখন ?
কেমন মিথ্যার সত্যে সজ্জিত সে লোক,
কেমন বিচার সহে সে দেশের লোক।
এমন অদ্ভুত সৃষ্টি এদেশে যাহার,
নাজানি সে দেশে কত অত্যাদ্ভুত আর !

এদিকে উকিল করে উত্তম বক্তৃতা,
"এ ব্যক্তি যে খুনী তা'তে নাহিক অন্যথা
খুন করি অনুতাপে লজ্জিত এখন,
কি বলিবে তাই মুখে না সরে বচন।
নির্দ্দোষ চণ্ডালপুত্রে হত্যা করিয়াছে,
উহারি নিজের পত্নী চক্ষে দেখিয়াছে।
পত্নী ওর অবশ্য অসত্য পক্ষে নয়,—
হবে কেন ? উচ্চবংশে জন্ম তার হয়।
রূপে গুণে বুদ্ধিমতী মহাধর্ম্মশীলা,
অসম্ভব তার মুখে মিথ্যা কথা বলা।
তার সাক্ষ্য শত সাক্ষ্য উপরে ধর্ত্তব্য,
প্রাণদণ্ডে দণ্ড করা ইহাকে কর্ত্তব্য।"

কত যুক্তি সহ কত বক্তৃতা তাহার,
আদালতে বাহাদুর উকিল মোক্তার।
অবশেষে আদালতে বাহিরিল রায়,
দণ্ডিত গোঁসাই প্রাণদণ্ডের আজ্ঞায়।

পুলিশের কর্ম্মচারী যে তদন্তকারী,
আর যে উকীল আদালতে সরকারী,
আনন্দের হাসি হাসি বসে মহাসুখে ;
জজ্ কিন্তু রায় দিয়া অপ্রসন্ন মুখে।

হেন কালে মুসলমান,
হয়ে কিছু আগুয়ান
করজোড়ে উচ্চৈস্বরে কহে বিচারকে,
"কে করিল হত্যা, তুমি ফাঁশি দেও কাকে!
বিচারক হও যদি ধর্ম্মসাক্ষী করি,
কর যদি সুবিচার সে ঈশ্বরে স্মরি,
তবে শুন মোর কাছে,
যে ভাবে যা ঘটিয়াছে,
"এই যে গোঁসাই মোর ক্ষেত্র নিল কাড়ি,
ঘরে অগ্নি দিতে আমি পশি ওর বাড়ী।
প্রবেশি দেখিনু ওর পত্নী দ্বিচারিণী,
বোনার সহিত বসি করে কানাকানি।
বোনা বলে, "শুনহে গোঁসাই ঠাকুরাণি,
তোমার এ পুত্রটাকে নহে ভাল জানি।
ও যদি প্রকাশ করে মোদের গোপন,
কঠিন হইবে মোর জীবন ধারণ।
অতএব পুত্রটাকে হয় বধ কর,
না হয় আমার ভালবাসা তুমি ছাড়।"
পাপিয়সী কহে, "পুত্রে বধি কি প্রকারে?"
বোনা কহে, "কোলে করি চল ঢেকী ঘরে,
সেখানে উহার শিরে মুগুর মারিয়া,
মাথা চূর্ণ করি দিব গঙ্গায় ফেলিয়া।
সুধালে কহিও পুত্র গেছে হারাইয়া,
দিন দুই তুমি কিছু ফিরিও কাঁন্দিয়া।"
রাক্ষসী তাহার বাক্যে সম্মতা হইল,
ঘুমন্ত সন্তানে বুকে তুলিয়া লইল।

রাক্ষসী চলিল আগে বোনা পাছে যায়,
এ অধম দেখি শুনি চৈতন্য হারায়।
পুত্রটাকে বাঁচাইতে মনস্থ করিয়া,
মুগুর ধরিনু আমি অগ্রে ঘরে গিয়া।
লুকাইয়া রহিলাম আঁধারে আড়ালে,
বোনা যবে যায়, আমি "আল্লা আল্লা" বলে,
এক বাড়ি মারিলাম পাপীর মাথায়,
এক বাড়ি খাইয়াই জন্মের বিদায়।
কোথায় গোঁসাই ছিল কোথায় বা খুন,
কোন খোঁজ নাই ধন্য তদন্তের গুণ!!
আমি সেই হত্যাকারী গোঁসাই নির্দ্দোষ,
সুবিচার করি কর ঈশ্বরে সন্তোষ।
শিশু রক্ষা তরে আমি করিয়াছি খুন,
মূর্খ আমি নাহি জানি কি দোষ কি গুণ।"

শুনি আদালত মধ্যে অদ্ভুত বিস্ময়,
আবার নূতন করি মোকদ্দমা হয়।
এবার গোঁসাই দিল জুটিয়া প্রমাণ,
বিচারে বিমুক্ত হ'ল কৃষক-সন্তান।
সহরের সর্ব্বজনে সেই মুসল্‌মানে,
সভা করি সাজাইল মালা সচন্দনে।

রাক্ষসী সে বৃন্দা শেষে গেল কারাগারে,
গেল প্রাণ কতরূপ রোগে অত্যাচারে।
কালীর বিচার ফল ফলে হাতে হাতে
মারিতে আসিয়া বোনা মল অপঘাতে।

মুগুর—মুগুর নহে কালীর কৃপাণ,
কালীর সিপাই সেই রাত্রে মুসল্‌মান।

ঘরপোড়া বুদ্ধি দিয়া তাকে মা আনিল,
শত্রুকে করিয়া মিত্র, পুত্রে বাঁচাইল।
বাঁচাল গোকুলে প্রাণদণ্ডাদেশ হ'তে,
উড়াইল ধর্ম্মের নিশান ত্রিজগতে।
উকিল মোক্তার নাই তাঁর আদালতে,
তদন্তের ভার নাই পুলিশের হাতে।
করিতে হয় না আর্জি দাখিল তথায়;
আপনি সে সাক্ষী; কারো সাক্ষী নাহি চায়।
আপনি বিচারকর্ত্রী ত্রিকাল দর্শিনী,
বিচার করিছে বসি দিবস রজনী।
তত্ত্বদর্শী সাধক নিরখি স্বনয়নে,
প্রতিহিংসা পথে নাহি ভ্রমেও গমনে।"

সে নিজে রাজার রাজা সম্রাট সম্রাট,—
তাঁর বিনির্ম্মিত রাজ্য এ বিশ্ব বিরাট।
দেবতা হইতে ক্ষুদ্র কীটাণু পর্য্যন্ত,
তাঁর আজ্ঞাধীন, তাঁর বলে বলবন্ত।
ভাল মন্দ যে যা করে সমস্ত সে জ্ঞাত,
—বিন্দু সিন্ধু কেহ নহে দৃষ্টি বহির্ভূত।
বিচারের কর্ত্তা সেই বুঝিয়াছে যারা,
হিংসকে করিতে দণ্ড নাহি যায় তারা।

শিবানন্দে কালসর্পে দংশন করিল,
শিবানন্দ স্থির, সর্প আপনি মরিল। ১

১। শিবানন্দ ব্রহ্মচারীকে পরাশরাশ্রমে বেলা চারিটার সময় এক গোক্ষুর সর্পে দংশন করে। তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সর্প এক দণ্ডের মধ্যে সেইস্থানে মরিয়া গেল।

নির্ব্বোধ ধীবর হ'ল মিথ্যার প্রপাত,
মাগুরার আদালতে সহে বজ্রাঘাত। ২
সতী ইন্দুমতী দুর্গাদাসী বিবরণ
পরচারে নিত্য ন্যায় ধর্ম্মের শাসন।
বর্ত্তমানে তপস্বী ধার্ম্মিক কেহ আর,
না হইতে চায়, নাই ধর্ম্মের বিচার।
মিথ্যায় সংসার ভরা, সবে মিথ্যাময়,
সত্যের মহিমা তাই দর্শনীয় নয়।
নির্ভরি পরমেশ্বরে সত্যে যারা রয়
সত্যদেব তাহাদের পরম আশ্রয়।"
বলেন আভীরানন্দ, "অদ্ভুত সংবাদ,
দৈবের বিচারে কারো নাহি প্রতিবাদ।
কিন্তু প্রাণে বাজে বড় বৃন্দার চরিত্র,
গড়িল কি বিধি তাহা এতই বিচিত্র।
রমণী জাতির প্রতি জন্মে ইথে ঘৃণা।"
উত্তরে সন্তান, "কভু এমন বল' না।

২। বাবুনৃপেন্দ্রনাথ পাল (নিবাস শক্রজিৎপুর,—যশোহর) মাগুরার আদালতে একজন শ্রেষ্ঠ উকীল। এখনও জীবিত আছেন। তিনি বলিলেন "আমাদের প্রথম ওকালতির সময় আঠার থাদার এক জেলে তার গুরুর সঙ্গে মোকদ্দমা বাধায়। দয়ানিধিবাবু তখন মুন্সেফ। আদালত তখন খড়ের ঘরে। জেলে গুরুর বিরুদ্ধে যাহা মুখে আসে বলিতে লাগিল। তার মিথ্যার জোরে আদালত স্তম্ভিত। গুরু দেশের মধ্যে তপস্বী ও ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত। তিনি জোড় হাত করিয়া কেবল উপরের দিকে চহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আকাশে সামান্য একটু মেঘ করিল। ঘরের মধ্যে আসিয়া জেলের মাথায় বজ্রপাত হইল। এই অত্যদ্ভুত ঘটনার পরে কিছুকাল মাগুরার আদালতে মিথ্যা মোকদ্দমা হয় নাই।" ১৩৩০ সাল ১১ই জ্যৈষ্ঠ, শত্রুজিতপুর। ইহা প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের ঘটনা।

তণ্ডুলের মধ্যে রহে কঙ্কর যেমন,
জননী জাতির মধ্যে কুলটা তেমন।
কঙ্করের দোষে কি তণ্ডুল কেহ ছাড়ে,
রান্ধিবার অগ্রে তাহা কুলো ধরি ঝাড়ে।
অমৃত ফলের মধ্যে পোক যদি হয়
বঁটী পাতি অগ্রে কাটি শুদ্ধ করি লয়।
অমৃত গরল হয় প্রয়োগের দোষে,
তা বলিয়া অমৃতের উপরে কে রোষে।
রমণী যে স্নেহময়ী জননী প্রতিমা,
সন্দেহ কি আছে তায়,—নিত্য অনুপমা।
অনন্য প্রেমের উচ্চ দৃষ্টান্ত ধরায়,
রমণী-হৃদয় ভিন্ন কোথা পাওয়া যায়!
শূর্পনখা পঞ্চবটী কাননে আসিয়া,
সীতার গৌরব মাত্র যায় বাড়াইয়া!
আমি বলিলাম মাত্র কালীর বিচার,
নির্দ্দোষের পক্ষে কালীকৃপা কি প্রকার!
দোষীর অদৃষ্টে খড়্গ কি প্রকারে নাচে,
কালীর কৌশলে পুত্র কি প্রকারে বাঁচে।
নিত্য দেখি করুণার জ্বলন্ত প্রমাণ,
অবিশ্বাসী ভুলুয়ার নাহি জন্মে জ্ঞান।

শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী

ষষ্ঠ দিন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

জয় মা করুণাময়ী কুলকুণ্ডলিনী,
কৌলকুল মণ্ডলে মঙ্গলবিধায়িনী।
আধার কমলে চতুর্দ্দলে স্বয়ম্ভুর
বদনারবিন্দ মধুপানে ভরপূর।
সুষুম্না বাহিয়া কভু উঠিযা দ্বিদলে,
নৃত্য করে নাদশিরে রসের কৌশলে।
দোলে মা দোদুল্যমানা দ্বিদলে চৌদলে,
মার দোল দর্শনীয় যোগীন্দ্রমণ্ডলে।
জয় ব্রহ্মা জয় বিষ্ণু জয় মহেশ্বর,
যাঁরা ব্রহ্মময়ী কালী অর্চ্চনে তৎপর।
ইন্দ্র চন্দ্র বহ্নি বায়ু বরুণাদি জয়,
যাঁরা কালী পাদপদ্মে সর্ববদা তন্ময়।
জয় শ্রীশঙ্করাচার্য্য সর্ববগুণধাম,
সমগ্র জগতে জয়যুক্ত যাঁর নাম।

মাতৃভক্তমণ্ডলে সর্ব্বাগ্রে যাঁর জন্য,
সর্ব্বোচ্চ সম্মান বর্ত্তে ; সর্ব্বদা বরেণ্য।

জয় শ্রীত্রৈলঙ্গ স্বামী নির্দ্বন্দ্ব নিষ্কাম,
যাঁর জন্য সমুজ্জ্বল বারাণসী ধাম।
জয় শ্রীবিহারীলাল নিস্পৃহ সন্তান, ।১।
তুল্য শীতগ্রীষ্ম সুখদুঃখ মানামান।
জয় জয় পূর্ণানন্দ স্বামী মহারাজ,
যাঁর নামে-নতশির সন্ন্যাসী সমাজ।
জয় জয় শ্যামানন্দ সরস্বতী আর,
নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী চন্দ্র কামাখ্যার।
জয় শ্রীভাস্করানন্দ মুক্ত মহাজন,
মুক্তিক্ষেত্র কাশীধামে মনস্বীভূষণ।
জয় শ্রীবিশুদ্ধানন্দ জ্ঞানী শিরোমণি,
শুদ্ধজ্ঞানে অন্নপূর্ণা ভক্তিরস খনি।
জয় স্বামী মৌনিরাম স্থির ব্রহ্মচারী
যাঁর মাতৃভাবভক্তি বর্ণিবারে নারি।
জয় শ্রীওঙ্কারনাথ মণ্ডলী সকল,
জয় জয় যত ভক্ত সন্ন্যাসীর দল।
জয় জয় শ্রীরামপ্রসাদ মহাজন,
মহাশক্তিমান ভক্ত মনস্বীভূষণ।
যাঁর নামে ধন্য হালিসহর হইল,
যাঁর কালীকীর্ত্তনে এ বঙ্গ বিমোহিল।

১। বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়, কাশীধামে দশাশ্বমেধ ঘাটে রহিতেন ; শ্রীশ্রীত্রৈলঙ্গ স্বামীর মত সর্ব্ববিষয়ে নিস্পৃহ ও মৌনী ছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান ঢাকায় ছিল। তাঁহার প্রস্তরমূর্ত্তি এখনো দশাশ্বমেধ ঘাটে স্থাপিত আছে।

প্রসাদী সঙ্গীতসুধা শ্রবণে মঙ্গল,
—শ্রবণে মঙ্গল ; মনে বাড়ে ভক্তিবল।
ধরাপৃষ্ঠ বিদারিয়া উঠি গঙ্গাজল,
নিবাইল যে ভক্তের পিপাসা অনল।
যাঁহার গৌরবে বর্দ্ধমান বর্দ্ধমান,
দামোদর উদ্বেলিত শুনি যাঁর গান,
যাঁর নাম স্মরণে শঙ্করী তুষ্টা হন,
জয় সে কমলাকান্ত শান্ত মহাজন।
জয় জয় রামকৃষ্ণ শ্রীপরমহংস,
যাঁর কথামৃতে হয় হীনবুদ্ধি ধ্বংস।
মাতৃভাব মাতৃভক্তি প্রচার করিতে,
শ্রীপরমহংস অবতীর্ণ অবনীতে।
আদর্শ চরিত্র—ভাব ভক্তির সাগর,
জনমি করিল ধন্য এ আর্য্যনগর।
জয় জয় সর্ব্ববিদ্যা সর্ব্বানন্দ নাম,
আর্য্যদেশ সম্পূজিত বহু গুণধাম।
মহাশক্তিমান সিদ্ধ গার্হস্থ্য সন্তান,
অমাবস্যা নিশায় দেখায় পূর্ণ চান্দ।
মেহার যাঁহার জন্য তীর্থে পরিণত,
এখনও যাঁর বংশ শক্তি-সমন্বিত।
জয় জয় সেতরার সিদ্ধ শ্রীমাধব,
অর্দ্ধ-কালীপতি-শিব, জীবে শিব-শব।
জয় পূর্ণানন্দ সহ ব্রহ্মানন্দ গিরি,
যাঁর শৈল বহিলেন আপনি শঙ্করী।
যাঁর সঙ্গে তারিণীর লীলা অভিনয়,
শুনিলে বিস্ময়ে তনু রোমাঞ্চিত হয়।

[illegible]

পরম ভাগবত

স্বর্গীয় গোবিন্দ প্রসাদ রায়।

Bina press.

Amherst Stree
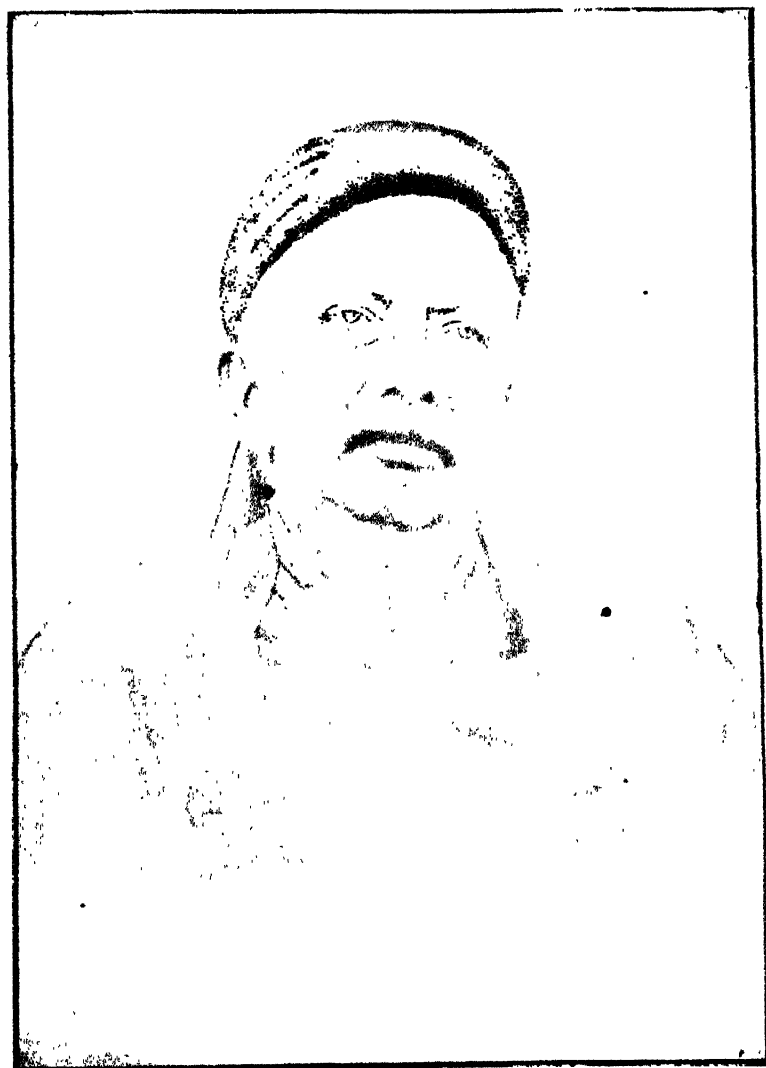
জয় জয় কামদেব তার্কিক মহান্,
জলন্ত চিতায় উঠি করিল প্রয়ান।
যাঁর বংশধর শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব,
সমগ্র ভারতে হিন্দু জাতির গৌরব।
যাঁহার শিষ্যত্ব লভি জাষ্টিস্ উড্রফ্
পাশ্চাত্য প্রদেশে শক্তিতত্ত্বের বিশপ্।
জয় দেব কামদেব, জয় শিবচন্দ্র,
মাতৃভাবতত্ত্বালোক দানে সূর্য্য চন্দ্র॥

জয় যাদবেন্দ্র দেব, সিদ্ধ মহাজন,
অবধূত সম্প্রদায়ে পরশরতন।
কামদেব তার্কিকের উত্তর সাধক,
ভূষণায় শুদ্ধাপ্রেম ভক্তি প্রচারক।
গোস্বামী শ্রীগোরাচান্দ যাঁর শিষ্য হন ;
রাজা সীতারাম যাঁকে করেন বর্দ্ধন ;
যাঁর সুমধুর পদ কীর্ত্তন-প্রভায়,
প্রভাবিত শত শত গৃহ ভূষণায়।

সহস্র সহস্র লোক সম্মুখে বসিল,
তার মধ্যে যে মহাত্মা অদৃশ্যে মিশিল,
যাঁহার মহিমা সঙ্কীর্ত্তন বন্দনায়,
গোস্বামী শ্রীগোরাচান্দ মহোল্লাসে গায়।
গাও তাঁর জয়,—গাও যাদবেন্দ্র জয়,
কামদেব যাদবেন্দ্র মহাকীর্ত্তিবাস,
জন্মে জন্মে হই যেন সে দোঁহার দাস।

জয় জয় ভবানীঠাকুর মহাজন।
সাধনা গগনে পূর্ণ ইন্দু সুশোভন।

যার নাম শ্রীভবানীপুরের গৌরব।
বিস্তৃত সর্ব্বত্র যাঁর যশের সৌরভ।

জয় রাজা রামকৃষ্ণ নাটোরাধিপতি,
মা নামে উন্মাদ, শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ়মতি।
জয় ভক্ত বামাক্ষেপা তারাপুরে রয়,
সদা ভক্তি ভাবোন্মত্ত তারার তনয়।
জয় জয় রামা শ্যামা ভাই দুইজন,
ছিল দস্যু, হ'ল ভক্ত সিদ্ধ মহাজন।
জয় জয় আগমবাগীশ কৃষ্ণকান্ত,
তন্ত্রসিন্ধু মন্থনিয়া করিল মোহান্ত।

জয় জয় তুঙ্গেশ্বরে শ্রীহরিশরণ
অন্তর্য্যামী হ'ল করি কালী আরাধন।

জয় জয় রাণী শ্রীভবানী দয়াবতী,
নাটোরের রাজলক্ষ্মী পুণ্যময়ী সতী।
কাশীবাসী সম্মুখে দ্বিতীয়া অন্নপূর্ণা,
যাঁর কীর্ত্তিগৌরবে সে বঙ্গভূমি ধন্যা।

জয় রাণী শরৎসুন্দরী পুটিয়ার,
সতী কুললক্ষ্মী আর মূর্ত্তি তপস্যার।
জয় জয় ধামশ্রেণী-রাণী সত্যবতী।
জয় পুণ্যময়ী, জয় সাধ্বী ইন্দুমতী।

জয় শ্রীনরেশচন্দ্র শ্রীরামদুলাল,
এ সংসারে শঙ্করীর কোলের ছাওয়াল।

জয় জয় শ্যামগ্রাম নিবাসী ভুবন,
জয় দ্বিজ শ্রীরামপ্রসাদ মহাজন।

জয় শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহান্।
কাত্যায়নী তত্ত্বগত যাঁর মন প্রাণ।
যাঁর শিষ্যগণে নাহি সঙ্কীর্ণতা লেশ,
যাঁর শিক্ষাফলে পুণ্যীকৃত বহুদেশ।

জয় জয় কৃষ্ণানন্দ স্বামী মহারাজ।
ম্লেচ্ছ করে যে উদ্ধারে আর্য্যের সমাজ।

জয় জয় জীবানন্দ ভদ্দর থালির।
জয় ভক্ত রামদত্ত নিবাসী বালির।
জয় শ্রীশরতচন্দ্র শ্রীহট্ট নিবাসী,
মহাভক্ত, সিদ্ধ, কালী-পদে সুবিশ্বাসী।

জয় ভক্ত যোগী জ্ঞানানন্দ অবধূত,
জয় সর্ব্ববিদ্যা শ্রীসতীশ তন্ত্রপুত।
শ্রীব্রহ্মাণ্ড বেদকর্ত্তা কাঙ্গালের জয়,
জয় সে ফিকির চাঁদ অমর অক্ষয়।

জয় দাশরথী ভক্ত কবি চূড়ামণি,
সুরসিক ভাগবত কাব্যরস খনি।
যাঁর পদামৃতের প্লাবনে বঙ্গদেশ
ভাসমান ; ভক্ত মুখে প্রশংসা অশেষ।
যাঁর গান অন্নপূর্ণা শুনেন ডাকিয়া।
তাঁর তুল্য ভাগবত না পাই খুঁজিয়া।

জয় সাধু গোবিন্দ চৌধুরী শেরপুরে।
যাঁর গানে সুধা ঝরে অক্ষরে অক্ষরে।
জয় মহাদেবপুরে শ্যামচন্দ্র নাম।
"পাগলের পাগলামী" ভক্তিরস ধাম।
জয় শ্রীরসিকচন্দ্র রায় গুণাকর।
ধন্য সাধু হরিদাস ভক্ত যোগিবর।
জয় বিদ্যাসাগর নাম নীলকমল
রঙ্গপুর গগনে সুধাংশু সমুজ্জ্বল।
জয় সে রসিকচন্দ্র পাঁচালী লেখক,
কালী পাদপদ্ম লাভে তেজস্বী সাধক।
জয় জয় গোবিন্দপ্রসাদ রায় ধন্য।
বিখ্যাত যে সাধক অতিথি সেবা জন্য।

জয় শ্রীবিবেকানন্দ স্বামী মহারাজ,
যায় ধন্য চিকাগোয়ে হিন্দুর সমাজ।
যার শক্তি প্রতিভায় এ ভারতে আজ,
প্রচারিত রুগ্ন দুস্থ সেবকের কাজ!
কালী নামে মত্ত মাতৃভাবের সাধক।
ভারতের পূর্ণ ইন্দু স্বদেশ-সেবক।

জয় মির্জ্জা হোসেনালি সাধক ধীমান,
সাধক-মণ্ডলে যাঁর অত্যুচ্চ সম্মান।
জয় ভক্ত দরাপালি ভক্তির সাগর,
যার মুখে জাহ্নবীর স্তোত্র শুনে নর।

জয় সিদ্ধ শ্রীচৈতন্য দাস নদীয়ায়,
জয় ভক্ত ভগবান দাস কালনায়।

জয় জয় কৃষ্ণদাস কাম্যবন বাসী।
জয় গোবর্দ্ধনে কৃষ্ণগোপাল সন্ন্যাসী।

যত ভক্ত ভাগবত আছে চরাচরে,
গাও মন সকলের জয় উচ্চৈস্বরে।
শৈব, সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণব যা হয়,
ভেদ ভুলি গাও মন সকলের জয়।
ভক্তগুণ কীর্ত্তন সাধনা কর সার,
ভক্ত কৃপা হ'লে কৃপা হবে শ্যামা মার।

বরাভয়-প্রদায়িনী ব্রহ্মময়ী তারা,
ভক্ত পূজা যেখানে সেখানে দেয় ধরা।
ভক্ত সঙ্গে তাঁহার আশ্চর্য্য অভিনয়।
যথার্থ মন্দির তাঁর ভক্তের হৃদয়।
ভক্তের মর্য্যাদা রক্ষা তপস্যা প্রধান।
ভক্তের পূজায় তুষ্ট নিত্য ভগবান।
ব্রাহ্মণ বা চণ্ডাল হউক অন্য আর।
ভক্ত সঙ্গে নাহি করি জাতির বিচার।
স্ত্রী পুরুষ যাহা হয় তাহাই উত্তম।
বালক যুবক বৃদ্ধ সবই অনুপম।
মাসান্তেও কালীনাম মুখে ফুটে যার।
সে মোর সর্ব্বস্ব, আমি নিত্যদাস তার।
ভুলুয়া শপথে পরশিয়া গঙ্গাজল।
সেই বন্ধু মাতৃভাব যাহার সম্বল।

ইতি শ্রীভক্ত নাম সঙ্কীর্ত্তন।

কেনোপমা ভবতু পরাক্রমস্য
রূপঞ্চ শত্রুভয় কার্য্যাতিহারি কুত্র,
চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
তয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি ॥

শ্রীশ্রীচণ্ডী।[১]

ধন্যা তুমি, বিশ্বরঙ্গ মঞ্চে অভিনেত্রি!
ধন্যা তুমি, বৈপরীত্যময়ি হে ত্রিনেত্রি!
সূক্ষ্মা স্থূলা ব্যক্ত্যাব্যক্ত্যা, কর্কশা-কোমলা,
তুল্য ক্রোধ ক্ষমাময়ী চঞ্চলা অচলা।
একাধারে বিপরীত প্রকৃতি তোমার,
না বিমোহি ভ্রান্তি নাশ কর ভুলুয়ার।

জিজ্ঞাসেন শ্যামানন্দ, গরীষ্ঠ সন্তান!
"শিবশক্তিময় বিশ্ব, কি তার প্রমাণ?"
উত্তরে সন্তান, শিবে যত অর্থ ধরি,
সর্ব্ব অর্থে সর্ব্বত্রই নিরীক্ষণ করি।
শক্তি আর শক্তিমানে ভেদ যদি নাই
শিব-শক্তি ভিন্ন কিছু বিশ্বে নাহি পাই।

যদি বল সংহারিকা শক্তি শিব হন,
সর্ব্বত্র সংহার-শক্তি কর দরশন।
সৃষ্টি স্থিতি সংহার ত্রিবিধ কর্ম্ম নিয়া,
প্রকৃতির অভিনয় সংসার জুড়িয়া।

১। দেবগণ স্তুতি করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে দেবি! কাহার সহিত তোমার এই পরাক্রমের তুলনা হইতে পারে? এমন শত্রু-ভীতিপ্রদ অথচ অতি মনোহর রূপই বা আর কাহার আছে? হে বরদে, চিত্তে কৃপা ও যুদ্ধে নিষ্ঠুরতা এই উভয়ের সমাবেশ ত্রিভুবনে কেবল তোমাতেই দেখা যায়।

তুমি আমি পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা যত
—কত কব,—যত আছে মো সবার মত,
কাল জন্মে, আজ থাকে, পরশু সংহার,
সংহারের স্রোতে সবে ভাসা অনিবার।
যত জন্মে, যত আছে, এক মৃত্যু-পথে
অবিরাম চলিতেছে, গুল্ম যথা স্রোতে।
সৃষ্টি-স্থিতি দুই শক্তি ব্রহ্মা বিষ্ণু হন,
তাঁহারাও সংহারক ভিন্ন অন্য নন।"
জিজ্ঞাসেন শ্যামানন্দ, ব্রহ্মা বিষ্ণু কিসে
সংহারিকা শক্তি, তাহা বল সবিশেষে।
উত্তরে সন্তান, "ব্রহ্মা করিতে সৃজন
এক ধ্বংস করি করে অন্যকে গঠন।
এক ভাঙ্গি অন্য গড়ে ব্রহ্মার এ ধর্ম্ম,
বিনা নাশে সৃষ্টি নাই, ইহা সত্য মর্ম্ম।
বৃক্ষ নাশি সৃষ্টি করি খাট পাট টুল,
লোহ দণ্ড ভাঙ্গি গড়ি কৃপাণ ত্রিশূল।
কূল ভাঙ্গি গড়ে নদী নিজ বক্ষে চর,
বংশ বন ধ্বংস করি গড়ে নরে ঘর।
তুমি আমি ধ্বংস-শক্তি করিয়া সহায়
নিজ প্রয়োজন করি নির্ম্মাণ ধরায়
পুনঃ দেখ আপনার দেহে চিন্তা করি,
সৃষ্টি শক্তি চলে মাত্র ধ্বংস শক্তি ধরি।
অথবা সে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা শিব বিনা,
এক দণ্ড কোন কার্য্য করিতে পারে না।
ভুক্ত দ্রব্য নাশে সৃষ্টি হয় রক্ত মাংস,
সৃজিতে সে ভক্ষ্য করি কত দ্রব্য ধ্বংস।

কত ফল মূল কত অন্নাদি ব্যঞ্জন,
কত মৎস্য মাংস নাশি ভক্ষ্যের সৃজন।
এক ধ্বংস করি করে অন্যের উৎপত্তি।
ধ্বংস বিনা সৃষ্টি নাই, ইহা উপপত্তি।
রক্ত মাংস অস্থি মজ্জা শুক্র পঞ্চ জন,
এক হ'তে অন্য জন্মে জানে বিচক্ষণ।
এই পঞ্চ বলে এই দেহের অস্তিত্ব,
এই পঞ্চ সংযোজন জীবে করে নিত্য।

এ দেহ রক্ষার জন্য এত যে যতন,
এত যে শয়ন আর উত্তম ভোজন,
রুগ্ন হলে করা এত ঔষধ সেবন,
শীত গ্রীষ্ম নিবারিতে এত যে বসন,
এত সাবধানে নিত্য রহি সর্ব্বদিকে,
তবুও যেতেছি নিত্য ধ্বংস অভিমুখে।

পুনঃ দেখ বিষ্ণু-কার্য্য ধর্ম্ম সংস্থাপন,
ধর্ম্ম সংস্থাপনে এই বিশ্বের পালন।
এ বিশ্ব-পালন জন্য বিষ্ণু কি প্রকার,
স্থাবর জঙ্গম নিত্য করিছে সংহার।
কত দৈত্য দানব বিনাশে অবতরি,
—প্রতি জীব রক্ষণে বিনাশে জীব ধরি।
দেশে দেশে রাজমূর্ত্তি করিয়া ধারণ,
করে কত দুষ্টে নাশ, ধৃষ্টের দলন।
কৃষ্ণরূপে করে কংস জরাসন্ধে নাশ,
কত ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ, করে মুখে গ্রাস।

উপপত্তি=সিদ্ধান্ত

রামরূপে ধ্বংসে লঙ্কাপতি দশানন
কুম্ভকর্ণ অতিকায় কত রক্ষগণ।
নরসিংহ মূর্ত্তি ধরি,—বিকট প্রকাশ,—
করে দৈত্যকুলেশ্বর কশিপু বিনাশ।
ধরিয়া বরাহ মূর্ত্তি হিরণ্যাক্ষ নাশে
—নিত্য সংহারের খেলা বিষ্ণুর আবাসে।
লোক ক্ষয় করা নিত্য স্বভাব তাহার
—নিজমুখে কহে পার্থে কাল মূর্ত্তি তার!
অতএব চিন্তা-চক্ষে কর নিরীক্ষণ,
বিষ্ণু তুল্য সংহারক বিশ্বে কোন্ জন?
অথবা সে শিবশক্তি বিষ্ণুমূর্ত্তি ধরি,
বিশ্বভরি ক্রিয়াশীল দেখ চিন্তা করি।
—অথবা সহজ বাক্যে সিদ্ধান্ত এখন,
ব্রহ্মা বিষ্ণু কেহ এক শিব ভিন্ন নন।
শিব কাল;—কাল ব্রহ্ম ত্রিশক্তি আধার।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব রূপে অভিনয় তাঁর।
সৃষ্টি স্থিতি যায়, তাহা নৈমিত্তিকা শক্তি;
সংহারিকা শক্তি নিত্যা, বলি দেয় যুক্তি।
এ জীবজগৎ লক্ষ্য দেখিবারে পাই,
ধ্বংস ভিন্ন কারো কোন পরিণাম নাই।
যেন সিন্ধুবক্ষে উঠি উত্তাল তরঙ্গ—
সগর্জ্জনে লম্ফ মারি চলে।
হারায় সে লম্ফ ঝম্প গম্ভীর গর্জ্জন,
কূলের নিকটবর্ত্তী হলে।

পার্থে কহে—শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—হে অর্জ্জুন! আমি সাক্ষাৎ লোকক্ষয়কারী কাল। লোকক্ষয় করিতে অবতীর্ণ হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

তথা জীব কালসিন্ধু-জলে সমুদিয়া
নিজ নিজ অহঙ্কারে চলে।
রহে না সে আর, যবে চলিতে চলিতে,
আসে কাল-মহাসিন্ধু কূলে!"
জিজ্ঞাসেন শ্যামানন্দ, "মঙ্গল-আলয়
শিব অর্থে যখন বুঝায়,
শিবশক্তিময় বিশ্ব,—সংহার দেখিয়া
কি প্রকারে চিন্তা করা যায়?"
উত্তরে সন্তান, "যদি শিবার্থে মঙ্গল,
তাহাতেও দেখ, তত্ত্বে মঙ্গল (ই) সকল।
কাহারো জনম ঘটে, কাহারো মরণ,
কেহ কীর্ত্তিমান, কেহ নিন্দার ভাজন।
কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ হয় রাজা,
অভিনয়-মঞ্চে যেন নানা সাজে সাজা।
কেহ হাসে, কেহ কান্দে, কেহ নাচে গায়
ভাবের ভাবুক রঙ্গ দেখিবারে পায়।
কেহ পিতা কেহ মাতা কেহ দারা সুত
কেহ হয় গুরু কেহ শিষ্য অনুগত।
কি অপূর্ব্ব অভিনয় রাজ্যৈশ্বর্য্য নিয়া,
কি আনন্দময়, জ্ঞানে দেখ বিচারিয়া।
হাসি কান্না নিয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনয়।
কান্না না থাকিলে হাসি বোধগম্য নয়।
বিরহের পরে পুণ্য মিলন যেমন,
মরণের পরে জন্ম সম্ভবে তেমন।
দুঃখ পরে সুখ হয় অতি মধুময়।
—সংহার যাহাকে বল সংহার তা নয়।

অভিনয় করিতে মরণে দুঃখ কার ?
যে সাজে রাবণ, দশরথ সে আবার।
পাঁচু কুণ্ডু অভিনয়ে সাজিয়া রাবণ,
আসরে যখন মরে কান্দে কোন্ জন ?
সেইরূপ ভব রঙ্গমঞ্চে অভিনয়,
যে বুঝে সে মরণে ব্যথিত কভু নয়।
জীবন মরণ পথে সাজি নানা রূপ,
অভিনয় করে জীব যেন বহুরূপ।
দেহ মাত্র পরিচ্ছদ হয় জীবাত্মার,
নানা পরিচ্ছদে জীব আসে বার বার !
অভিনয়ে যাতায়াত নাহি যদি ঘটে,
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য তাহে কি প্রকারে রটে !
সুধু রাম সীতা যদি করে অভিনয়,
কতক্ষণ কহ তাহা রুচিকর হয় ?
রাম যাবে, সীতা যাবে, আসিবে রাবণ,
আসিবে সুগ্রীব হনু মিত্র বিভীষণ।
হবে যুক্তি পরামর্শ বধিতে রাবণ,
রাবণ শুনিবে শূর্পনখার রোদন।
জ্বলিবে লঙ্কায় মহাযুদ্ধের অনল।
ভস্মীভূত হবে তায় রাক্ষসের দল।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞভঙ্গ করিবে লক্ষ্মণ।
হত হবে ইন্দ্রজিৎ রাক্ষস-ভূষণ।
ধ্বংস হবে দশানন বংশের সহিত,—
জয়োল্লাসে গাবে কপি মঙ্গল-সঙ্গীত।
উত্তীর্ণা হইবে সীতা অগ্নি পরীক্ষায়,
দেখাইবে সতীত্বের মহামহিমায়।

হেন সীতাদেবী; রাম করিয়া বর্জ্জন,
রাজ-ধর্ম্ম রাখি প্রজা করিবে রঞ্জন।
তবে ত হইবে অভিনয় সুমধুর।
—রাক্ষস সংহারে ঘটে মঙ্গল প্রচুর।
যীশুখৃষ্ট, সক্রেটিস অন্যায় বিচারে
না মারিলে,—এত শ্রেষ্ঠ না হ'ত সংসারে।
সাধু মহাপুরুষের মরণ মঙ্গল,
মরণের পরে তাঁরা অধিক উজ্জ্বল।
মায়ারূপ অন্ধকারে দৃষ্টি রুদ্ধ যার,
সংহারের নাম শুনি চিত্ত কাঁপে তার।
কিন্তু যারা প্রাকৃতিক সত্যদৃষ্টি-যুক্ত,
সংহারের অভিনয়ে তারা ভয়মুক্ত।
ভোরে উদি সন্ধ্যাকালে সূর্য্য অস্তে যায়,
সূর্য্যের এ অস্তমৃত্যু সন্তাপে কাহায়?
সূর্য্য যদি উদি আর অস্ত না যাইত,
সুখময় দিবারাত্রি কিরূপে হইত?
রাত্রি না ঘটিলে খর দিবাকর-করে,
পরিণত হ'ত ধরা দগ্ধীভূত ক্ষারে।
রাত্রি প্রয়োজন, সূর্য্য যায় অস্তাচলে।
সূর্য্যাস্তে বিপুল শান্তি ঘটে ধরাতলে।
দুগ্ধ মরি দধি হয়, দধি প্রয়োজন,
দধির নিমিত্ত চাহি দুগ্ধের মরণ।
চিন্ত পুনঃ যদি বিশ্বে মৃত্যু না ঘটিত,
দৃশ্যের মাধুর্য্য বিশ্বে কিসে সম্ভবিত?
জীবজন্তু বৃক্ষলতা হ'ত সংমিশ্রিত,
কি দৃশ্য ঘটিত তাহা চিন্তার অতীত।

অণু পরমাণু যথা প্রস্তরে সম্বদ্ধ।
জীবসঙ্ঘ তথা হ'ত পরস্পর বদ্ধ।
  না রহিত বিন্দু স্থান শুইতে বসিতে,
কর্ম্ম-ক্ষেত্র না রহিত এই ধরণীতে।
পশ্চাতের কার্য্যতরে পূর্ব্বদল যায়।
নিত্য নব ভাবে নব সৌন্দর্য্য বাড়ায়।
বিশাল সংসার-রণে কর্ম্মবীর যারা,
সংহারের পথে চলে বিশ্রামিতে তারা।
তাপত্রয়ে জর্জ্জরিত হইয়া মানব.
লাভ করে মৃত্যুপথে অব্যাহতি সব।
  জরাগ্রস্ত কলেবরে মরণ সহায়,
মরণ সংসার-কারামুক্তির উপায়।
দুঃখময় জীবনের মরণ বান্ধব,
মর্ম্মযাতনায় শান্তি মরণে সম্ভব।
  সংহারে কি সুমঙ্গল, এক সাক্ষী তার,
জাপানের বীরবৃন্দ করিল প্রচার।
পাঁচ লক্ষ জাপানী করিয়া প্রাণত্যাগ,
সম্পাদিল জাপানের মহাকীর্ত্তি যাগ।
সংহারে মঙ্গল যদি তারা না বুঝিত,—
জাপানের কীর্ত্তিস্তম্ভ কিসে উত্তোলিত?
মরণের নাম মুক্তি, মুক্তিনাথ শিব,
অশক্ত বুঝিতে তাহা মায়াবদ্ধ জীব।
  এ বিপুল বিশ্ব, ইহা লীলাক্ষেত্র হয়।
জীবসঙ্গে বিশ্বনাথ হেথা লীলাময়।
জন্মমৃত্যু—সুখদুঃখ—উত্থানপতন,
নিজ হস্তে কালব্রহ্ম করি সম্পাদন,

করিতেছে বিশ্বভরি অপূর্ব্বাভিনয়,
দর্শনীয় তত্ত্বদর্শী ভাবুকে নিশ্চয়।
একমাত্র শিবশক্তিময় এই বিশ্ব!
উচ্চ জ্ঞানে উদ্ভাসিত সে মধুর দৃশ্য।
বলেন শ্রীপূর্ণানন্দ, সস্নেহ বচনে,
"পুনঃ এক প্রশ্ন মোর উঠিতেছে মনে,
পরমপুরুষ শিব, পরমাপ্রকৃতি—
উমা তাঁর শক্তি ;—অর্থ ধরিলে সম্প্রতি
শিবশক্তিময় বিশ্ব বলি কি প্রকারে?"
সহজ সরল বাক্যে সন্তান উত্তরে,—
এক ব্রহ্ম দুই ভাগে পুরুষ প্রকৃতি
ক্রিয়া করে,—নির্গুণের নিষ্ক্রিয় বসতি।
প্রকৃতি পুরুষ ভিন্ন ক্রিয়া অসম্ভবে।
প্রকৃতি পুরুষে উমাশিব কহে সবে।
প্রকৃতি পুরুষে যদি স্ত্রীপুরুষ ধরি,
শিবগৌরী ভিন্ন কিছু বিশ্বে নাহি হেরি।
শিবগৌরী বিরাজিতা প্রতি ঘরে ঘরে,
ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে কুমারী কুমারে।
মানবী মানব পার্শ্বে দানবী দানবে,
রাক্ষসী রাক্ষস পার্শ্বে দেবী রূপে দেবে।
কীটে পতঙ্গমে, বনচরে কি খেচরে,
সর্ব্বত্র শ্রীশিবগৌরী রাসক্রীড়া করে।
বৃক্ষ লতা তৃণ কিংবা পর্ব্বত সাগর,
তাহারাও প্রকৃতি পুরুষ কলেবর।
তণ্ডুল মটর কিংবা গোধূম ভাঙ্গিয়া,
দেখি তথা শিবগৌরী আছে দাঁড়াইয়া।

এই তব কলেবর চিন্তিলে বুঝিবে,
এক ভাগ প্রকৃতি পুরুষ অন্য হবে।
এক ব্রহ্ম প্রকৃতি পুরুষ রূপ ধরি,
আসূর্য্য রেণু পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত বিশ্বভরি।
প্রকৃতি পুরুষ যন্ত্র ভিন্ন এই ভবে,
তিনকালে কখনও কিছু না সম্ভবে।
নির্গুণ আপন গুণে গুণময় হয়,
প্রতি দেহে প্রকৃতিপুরুষ রূপে রয়।
প্রকৃতি ত পুরুষের শক্তিরূপে পাই,
অতএব শিবশক্তি ভিন্ন কিছু নাই।
জানে তত্ত্ব নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ
আর জানে ব্রহ্মচর্য্যে আস্থিত যে জন।
সাধকের বোধ্য ইহা, বোধ্য তপস্বীর।
—বোধ্য ইহা স্থিতধীর, বোধ্য মনস্বীর।"
সুধান শ্রীশিবানন্দ, সস্নেহ বচনে,
"কি লক্ষণে চেনা যায় ব্রহ্মচারী জনে?"
প্রণমি সন্তান বলে, "তুমি ব্রহ্মচারী,
তোমার লক্ষণ আমি কি বলিতে পারি?
তোমা সঙ্গে রহি যাহা শিক্ষা করিয়াছি,
জিজ্ঞাসিলে যদি, মাত্র তাই বলিতেছি।
ব্রহ্মচারী যত্নে অন্তরেন্দ্রিয় দমিয়া
গুরুসঙ্গে করে বাস আগ্রহ করিয়া।
গায়ত্রী সেবিয়া করে ত্রিসন্ধ্যা বন্দনা,
কিন্তু গুরুসেবা তার মুখ্য উপাসনা।
গুরুবাক্য লঙ্ঘি, শাস্ত্রবাক্য নাহি মানে,
গুরুবাক্য শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র, ইহা মাত্র জানে।

অগ্নি সূর্য্য গুরুপূজা করে প্রতিদিন,
সুনির্ম্মল চিত্ত, মাত্র সত্যের অধীন।
প্রভাতে সন্ধ্যায় রহি মৌনাবলম্বনে,
আপনার ইষ্টকৃত্য করে সাবধানে।
দেহ মন স্থির করি সুখপদ্মাসনে,
গুরুর সম্মুখে বসে শাস্ত্র অধ্যয়নে।
আরম্ভ সমাপ্তি কালে, জ্ঞানপ্রদায়কে,
ব্রহ্মচারী নমস্কারে বিনম্র মস্তকে।
যথাবিধি জটা দণ্ড কমণ্ডলু আর,
মৃগচর্ম্ম মেখলা তাহার অলঙ্কার।
প্রত্যহ করিয়া ভিক্ষা গুরুকে অর্পণে,
গুরুর সেবান্তে বসে প্রসাদ গ্রহণে।
উঠে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে, প্রত্যূষে করে স্নান,
মৌনাবলম্বনে করে ইষ্টপূজা ধ্যান।
সাবধানে দিবানিদ্রা করে পরিহার,
হবিষ্যান্ন ফল মূল দুগ্ধ ভোজ্য তার।
আলস্যবিহীন, মনে উৎসাহ বিপুল,
কর্ত্তব্য সাধনে তার নাহি বিন্দু ভুল।
পরাৎপর ভিন্ন, পরচর্চ্চা নাহি করে,
—করা দূরে, শুনিলে সে চলি যায় দূরে।
মৃত্তিকায় দৃষ্টি তার প্রমদা দর্শনে।
প্রমদার সাহচর্য্য বর্জ্জে দৃঢ়মনে।
অষ্টবিধ রতিসঙ্গ আর মদ্যপান,
ব্রহ্মচারী করে ত্যাগ বিষ্ঠার সমান।
বিন্যাস না করে কেশ, গাত্র নাহি মাজে।
ভূষণ চন্দন মাল্য সাজে নাহি সাজে।

বিষজ্ঞানে বিলাসিতা বর্জ্জি অনুক্ষণ।
পদে চর্ম্ম পাদুকা না পরশে কখন।
অধ্যয়ন-পরায়ণ, নারায়ণ প্রিয়,
—নারায়ণ তুল্য, ব্রহ্মচারী দর্শনীয়।
ব্রহ্মচারী বিশ্বভরি প্রণম্য সবার,
ব্রহ্মচারী তুল্য লোকে তপস্বী কে আর?
ব্রতান্তে গুরূপদেশে গৃহস্থ সে হয়।
অথবা সন্ন্যাসী হয় অনেক সময়।
গৃহস্থ হইলে হয় সে উপকুর্ব্বান।
—মাধুর্য্য আস্বাদি নাহি ছাড়ে আচরণ।"
সুধান আভীরানন্দ, "ব্রহ্মচর্য্য বলে
সাধক কি শক্তিলাভ করে ধরাতলে?"
উত্তরে সন্তান, "আমি কি বলিব তার,
ব্রহ্মচর্য্যে হয় সর্ব্ব শক্তির আধার।
ভগবান দত্তাত্রেয় সম্মুখে যখন,
জিজ্ঞাসু হইয়া যান বালখিল্যগণ,
ভগবান দত্তাত্রেয় বলেন তখন,
মৃত্যুঞ্জয়ে বাঞ্ছা যদি, করিয়া যতন
ব্রহ্মচর্য্যে রহ স্থির, বীর্য্য রক্ষা কর।
বীর্য্য ব্রহ্ম, জ্ঞান করি যত্নে শিরে ধর।
ব্রহ্মচর্য্যে যে দেহের বীর্য্য রক্ষা করে,
জরা, ব্যাধি মৃত্যু তার আজ্ঞা শিরে ধরে।
ভগবান মনুবাক্যে নিরখিতে পাই,
বিন্দু স্থির যে রাখে, তাহার মৃত্যু নাই।
চিন্তা যদি করি এই দেহের বিষয়,
দেখি, বীর্য্য সর্ব্বমূলে দেহের আশ্রয়।

ভুক্ত দ্রব্য হ'তে হয় রক্তের উৎপত্তি,
রক্ত হ'তে হয় মাংস, যাহে রক্ত-স্থিতি,
লইয়া মাংসের সার অস্থি বিনির্ম্মিত,
আশ্রয় করিয়া অস্থি মাংস সুরক্ষিত,
অস্থিসারে জন্মে মজ্জা অস্থির আশ্রয়,
মজ্জার আশ্রয় বীর্য্য মজ্জাসারে হয়।
অতএব বীর্য্য সর্ব্ব দেহের আশ্রয়,
—দেহাংশ বিচার করি দেখ মহোদয়!
শত ভাগ ভোজ্যে এক ভাগ রক্ত হয়;
শত বিন্দু রক্তে এক বিন্দু মাংস হয়;
শত বিন্দু মাংসে এক বিন্দু অস্থি হয়;
শত বিন্দু অস্থিসারে বিন্দু মজ্জা হয়;
শত বিন্দু মজ্জাসারে এক বিন্দু বীর্য্য;
তেজোসিন্ধু মন্থি যেন প্রাপ্ত হই সূর্য্য।
হেন বীর্য্য যত্ন করি যে করে রক্ষণ,
বৃদ্ধকালে থাকে তার শরীরে যৌবন।
মুখের লাবণ্য তার দৃষ্টি আকর্ষক,
জনপতি সর্ব্বত্র সে, পন্থা প্রদর্শক।
অক্ষত মস্তিষ্ক তার উত্তম ধারক,
বুদ্ধি তার প্রখর, সে সঙ্কটে পালক।
লক্ষ্য তার স্থির, গুরু সত্য নির্ণায়ক।
বীরশ্রেষ্ঠ বীর সেই, মনুষ্য নায়ক।
বক্ষে তার দুর্জ্জয় সাহস, বিশ্বজয়ী,
স্থির লক্ষ্যে সে পারে ধরিতে ব্রহ্মময়ী।
কর্ত্তব্যে অটল সেই, ধৈর্য্যে হিমালয়,
নীচ কর্ম্মে দৃষ্টি তার নয়নে না রয়।

বিশ্বাসী সে বিশ্বনাথে, বিনা অধ্যয়নে,
সর্ব্বশাস্ত্র মর্ম্মবেত্তা সে জন ভুবনে।
জনমিলে মৃত্যু ঘটে, এ কথা নিশ্চয়,
কিন্তু ব্রহ্মচারী নাহি করে মৃত্যু ভয়।
ইচ্ছামৃত্যু মরে সেই মহা মহাপ্রাণ,
ভীষ্ম, হরিদাস তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।
হায় হেন ব্রহ্মচর্য্যে নাহি অনুরাগ।
মর্ত্ত্যে নাহি ভুলুয়ার সমান দুর্ভাগ॥
বলেন শ্রীপূর্ণানন্দ, "উত্তম সঙ্গীত,
সঙ্গীত করিয়া আজ কর হরষিত।"
সন্তান আপন মনে আরম্ভিল গান।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে সন্ধ্যা, বেলা অবসান।

ইন্দ্র-নীল-মণি-নিন্দিত-নির্ম্মল নীল ইন্দুবরণা।
কালহৃদয়মণি-মন্দির-নিবাসিনী নির্ম্মৎসর-শরণা॥
চন্দ্র সূর্য্য তারা জ্যোতি সমন্বিত
নয়ন নিন্দি-নভ-ভালে সমুত্থিত;
বিশ্বমূর্ত্তি ভব-সুন্দরী শঙ্করী মুক্তাম্বর-বসনা॥
দীন-আর্ত্ত-ভয়ভঞ্জিনী রঞ্জিনী,
ক্ষমা-নির্জ্জর-দ্বিজ-পশূদধি-বর্দ্ধিনী,
সত্য-ধর্ম্ম-ন্যায়-লঙ্ঘক দানব-মুণ্ড-মাল-ভূষণা॥
ইন্দু-ভালি-মুখ-ইন্দু নিরিখনে,
পরমানন্দে থির অনিমিখ-নয়নে;
পাদপদ্মমধু লোলুপ মধুকর প্রতি নিত কৃত-করুণা॥

তাপত্রয় করে মুক্তি লভিতে যদি,
চিত্তে বর্ত্তে আশ, বিশ্বাসি নিরবধি,
বিশ্বজননী-পাদপদ্ম হৃদয়ে কেন যত্নে ভুলুয়া ধরনা ॥

মাতৃস্নেহ।

বিচারিয়া দেখি, সর্ব্বোপরি মাতৃভাব ;
যাহে জন্মে অনায়াসে নির্ম্মল স্বভাব।
আরো দেখি, স্নেহময়ী সন্তানের দোষ,
সর্ব্বদা করেন ক্ষমা,
—সে ক্ষমার নাহি সীমা ;
সন্তানের সুখে মার সর্ব্বদা সন্তোষ।
সন্তানের দুঃখে মার দুঃখভরা রোষ ॥

জননীর সুখ দুঃখ সন্তানে বুঝেনা,
সম্মান করিতে মাকে সন্তানে জানেনা।
জননী অসুস্থা হয়
সন্তান বুকেই রয়,
জননীর কোল ছাড়ি নামিতে চাহেনা।
নামাইলে কান্দে, মার প্রাণে তা সহেনা

ছাই মাটী মাখি অঙ্গে আসিলে সন্তান,
জননীর চক্ষে শিশু শিবের সমান।
বলেন, "নির্ব্বোধ বেটা!
অঙ্গে ছাই মাখে কেটা?"
বলি পুত্রে অঙ্কে তুলি চুম্বেন বয়ান।
—তাতেই সন্তোষ মার, যা করে সন্তান।

সন্তান কেবল চায় জননীর কোল ;
সম্পদে বিপদে মুখে কেবলই 'মা' বোল।
জননীর অঙ্কে যদি রহিতে সে পারে,
কালের কিঙ্করে তাকে শঙ্কা দিতে নারে ॥
রাণী কিংবা ভিখারিনী জননী তাহার,
সন্তান বুঝেনা তাহা,
তার মনোবাঞ্ছা যাহা,
জননীর কাছে চায়,—করে আবদার।
না দিতে পারিলে মার বহে অশ্রুধার।
ধন্য ধন্য মাতৃস্নেহ, ধন্য জন্ম তার,
নির্ম্মল সুধার সদ্ম
জননীর পাদপদ্ম,—
যত্ন করি যে করেছে হৃদয়ের হার।
ধন্য সেই ধরণীর অঙ্কে অলঙ্কার।
হেন মাতৃভক্তি ভুলি অন্য পথে যাই,
ভুলুয়ার মত ভ্রান্ত ত্রিভুবনে নাই ॥

দোষ স্বীকার।

স্নেহময়ী তুমি ;—তব চরণ কমলে,
কৃপা প্রার্থনায় আর,
আছে কোন অধিকার,
চিন্তিয়া না পাই কিছু, একদিনও ভুলে,
বসি নাই মা বলিয়া তব পদমূলে।

সুখ বাঞ্ছা করি দুঃখ বরধক যাহা,
নৃত্য করি নিত্য আমি করিয়াছি তাহা।

মঙ্গলোপদেশ যত,
অবহেলি অবিরত,
হীন কর্ম্মে অধর্ম্মে উৎসাহে যাতায়াত,
কত করিয়াছি তাহা কহিব মা কত।
সত্যরূপে! যত সত্য বুঝি মনে মনে,
পারি যাহা উদ্গারিতে পর সম্ভাষণে,
নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে তাহা উলটি সকল।
—মিথ্যাবাদী কপটের কোথায় মঙ্গল!

দুর্ব্বাসনা-মত্ত আমি, দুর্জ্জনের সঙ্গে
দুর্ল্লভ জীবন ক্ষয় করিয়াছি রঙ্গে।
এখন ত সন্ধ্যা কাল!
শিরে উপবিষ্ট কাল!
অবসন্ন চিত্ত, কোন শক্তি নাহি অঙ্গে;
এখনও আছি দুর্ব্বাসনার তরঙ্গে।

রাজরাজেশ্বরী তুমি, সর্ব্বান্তর্য্যামিনি!
এ আসন্ন কালে দোষ স্বীকারিনু আমি।
বিচারে যা হয় কর,
—হয় রাখ, ন'য় মার!—
তোমারি পবিত্র নাম করি উচ্চারণ,
প্রস্তুত ভুলুয়া তাহা করিতে গ্রহণ॥

———

মনের প্রতি।

মনরে যে সুখে পরমায়ু ক্ষয়,
পরম মঙ্গল ঘটে না,

সে সুখের তরে, এ উচ্চ জনমে,
প্রয়াস কভুও খাটে না ॥
যত্ন না নিলেও দুঃখ যথা আসি,
ঘরে ঘরে ঘটায় যাতনা ।
দেহী মাত্রে তথা, ইন্দ্রিয়ের সুখ,
স্বভাবেই হয় ঘটনা ।
তুচ্ছ সুখ ভোগে প্রয়াসী যে হয়,
উচ্চে দৃষ্টি তার উঠে না ।
অন্ধকারে ভরা, অন্তর তাহার ;
নিত্যানন্দ তায় ফুটে না ।
পরম মঙ্গলময়ী পরমেশী ;
মঙ্গলে যদি রে বাসনা ।
সুখের প্রয়াসী মঙ্গলাশী মন !
তাঁহার ধেয়ানে বস না ?
ভোগাপেক্ষা ত্যাগ সদানন্দ-ধাম,
তা ভুলুযার মনে উঠে না ।
তাই তাহার ভালে, এবার এ সংসারে,
এক বিন্দু শান্তি জুঠে না ॥

বিস্ময়ে ।

এখানে আসার, কথা ত ছিল না,
তবু কেন হেথা আসিলাম !
কোন্ প্রয়োজনে, কে আনিল হেথা,
'তাহাও ত নাহি বুঝিলাম !
মোর মত হীন কাঙ্গালের প্রভু
আছে একজন শুনিলাম,

আশার আশায়, তাই বুক বান্ধি,
তাঁয় দেখিবারে ছুটিলাম।
কত দেশ, কত পর্ব্বত, প্রান্তর,
কত হ্রদ, নদী ঘুরিলাম।
কোথায় সে মোর, কাঙ্গালের প্রভু,
কত জনে ডাকি সুধালাম।
চাই যাহা, তাহা কেহ না কহিল,
কি কহিল নাহি বুঝিলাম।
আশার উপরে তবু আশা করি,
ঘুরিতেছি আমি অবিরাম।
জান যদি কেহ, দেও গো বলিয়া,
কোথায় সে প্রভু প্রাণারাম,
যাঁহার অভয় চরণ দুখানি,
ভুলুয়ার চির সুখধাম॥

সাবধানতা।

এ বিশাল বিশ্বপটে, কপালে কবে কি ঘটে,
জানিতে শকতি আছে কার?
বিঘন বিপদ যত আসিয়া চোরের মত,
হাসা মুখ করে অন্ধকার।
পাছে পাছে ফিরি কাল, না বিচারি কালাকাল,
খবর না দিয়া প্রাণ হরে।
আত্মীয় স্বজন সবে, দুখের সাগরে ডুবে,
এ ঘটনা প্রতি ঘরে ঘরে॥

তবু মোর মোর রবে, সুখাশায় ঘুরে সবে,
পরিণাম না করি বিচার।
সুখদাতা যে তাঁহাকে, একবারো নাহি ডাকে,
বলিহারি কুহক মায়ার।
নাহি যাহে সংবন্ধ, তার প্রতি অনুবন্ধ,
বন্ধু প্রতি প্রেমগন্ধ নাই।
ভুলুয়ার কি দুর্ম্মতি; ভাবি তাই দিবারাতি,
দুর্গতির সীমা নাহি পাই॥

কর্ত্তা।

সুখভোগ জন্য, অনন্ত অন্তরে,
কেবা নাহি যত্ন করে?
কেহ লব্ধ-সুখ, কেহ দগ্ধ-বুক,
কেহ বা নিঃশব্দে মরে।
বাণিজ্য করিয়া, অর্থ উপার্জ্জিতে,
সকলেই যাত্রা করে,
কারো পূর্ণ আশ, কারো সর্ব্বনাশ,
চলে আর চক্ষু ঝরে।
কেহ নির্ম্মে গৃহ, বাস বাঞ্ছা করি,
আগুনে তা হয় ভস্ম।
কাহারো বর্ষায় বসন্ত আগমে,
কারো হয় শীতে গ্রীষ্ম।
ন্যায়ের মর্য্যাদা রাখিতে যাইয়া,
কেহ অপরাধী দূষ্য।
কেহ ন্যায় ধর্ম্ম চরণে দলিয়া,
ধর্ম্মরাজ গৃহে পোষ্য।

২০

কত দুষ্ট খল, মিথ্যা সমর্থিয়া,
হয় লোক মাঝে গণ্য।
কত লোক পূজ্য মঙ্গল সুহৃদ,
লাঞ্ছিত সত্যের জন্য।
কত লৌহ সীস, আদরে বিকায়,
অনাদরে রহে স্বর্ণ।
হেন বৈপরীত্য, কেন নিত্য ? কার
সাধ্য বুঝে এক বর্ণ ?
হেন বৈপ্যরীত্য ইহার মূলে কি
কেবলই কর্ম্ম ? সুধায় ধীর ;
উত্তরে ভুলুয়া, কর্ম্মের উপরে,
আছে এক জন, জানিও থির ॥

আত্মতৃপ্ত।

কত রোগে শোকে অভাব-কবলে,
কত দুঃখে লোক রহিয়াছে !
কত অনাহার, কত অশয়ন,
কত প্রাণপাতে সহিছে !
কত লোক কত নির্দ্দয় পিশাচ—
—করে অপঘাতে মরিছে !
কত দুষ্ট কত কাঙ্গালের গ্রাস,
কত ছলে বলে হরিছে !
কত অন্ধ, কত খঞ্জ নিরুপায়,
কত গঞ্জনায় জ্বলিছে !
কত দুঃখ কত ভাবে লোকে সহি,
"ম'লাম ম'লাম" বলিছে !

সে তুলনে আমি বহু সুখে আছি,
বহু কৃপা মোরে বিধাতার,
অযোগ্য আমার প্রতি এত দয়া,
—নমস্কার করি বার বার !
পরমেশী নাম গায় অবিরাম,
তাঁর পদ শিরে ধরিয়া,
ভুলুয়া যে সুখে রহিল এবার,
উপমা না মিলে খুঁজিয়া ॥

দোহাই ।

দোহাই তোমার চরণে ।
মানুষ হইয়া হাসিভরা মুখ,
ঢাকিও না কালো বরণে ।
এ তিন ভুবন পরখিয়া দেখ
মানুষ ছাড়া কে হাসে,
মানুষ ছাড়া কে মিতালী করিয়া,
মধুর মধুর ভাষে ।
যতন করিয়া, মানুষ গড়িয়া,
বিধি কি করুণা কৈল !
সুধা ঢালিবার, মুখ গড়ি তায়,
হাসি রাশি আনি থুইল ।
এমন আশীষ লভিয়া,
আনন্দের মুখে যতন করিয়া
রাখিও না কালী মাখিয়া ॥

উপদেশ।

কাল যদি তব প্রতিকূল, তবে
কালী নাম কেন জপ না!
কাল চিরকাল কালী পদতলে,
সে কথা কি তুমি জান না?
অভাব-পেষণে যদি প্রতিদিন
সহিবারে হয় যাতনা,
তবে কালী নাম- কল্পতরু কেন
হৃদয় উদ্যানে রোপ না?
কল্পতরু তলে বসতি করিলে
অভাব কভুও রবে না।
অধিকন্তু তার শীতল ছায়ায়
দূর হবে ভব-বেদনা।
ভুলুয়া ভণয়ে, কথা সত্য, কিন্তু
রোপণে কি ফল বল না?
ভক্তি-রসামৃত নিত্য না সিঞ্চিলে,
কল্পতরু কভু বাঁচে না॥

কালের প্রতি।

কাল তোমায় এক অনুরোধ, আর
মোর প্রতিকূলে যেও না।
প্রতিকূলে যেয়ে প্রতিকূল হ'য়ে,
প্রতিদিন দুখ আর দিও না॥
তুমি যার পদ- তলে বাস কর,
মা আমার সেই ললনা।

(তার) করে কাল-খড়্গ　　কপালে অনল,
সে বড় প্রখরা ভীষণা ॥
আমায় দুঃখ দিলে,　　আমি যদি সই,
মা আমার তা ত সবে না।
সে যে, সন্তান গৌরবে　　বড় গরবিনী,
সে কথা কি তুমি জাননা ॥
তার রোষে কত　　রবি চন্দ্র খসে
নিশি দিনের ভেদ থাকে না।
হয়, নিশ্বাসে প্রলয়,　　বিশ্ব শূন্য হয়,
কারো দর্প সে ত রাখে না ॥
ভলুয়া কয় কালী-　　নাম যার মুখে,
কাল তার পাছে হাটে না।
হাটি কি করিবে　　কালীনাম যথা,
কালের জোর তথা খাটে না ॥

নির্ভরতা।

যে বলে বলুক　　মিথ্যা কালী পূজা,
আর তার কথা মানি না।
মহামহীয়সী　　ত্রিলোকেশী কালী
—পূজা ভিন্ন অন্য জানি না ॥
বরাভয়দাত্রী　　জগদ্ধাত্রী কালী
—পূজার যে কত মহিমা,
কালীপাদপদ্মে　　মন বান্ধা যার,
সে বই তা অন্যে বুঝে না ॥
কালের ভয় কালী-　　নামে দূরে যায়
রামপ্রসাদ তাহার নিশানা।

যখন ইচ্ছা কৈল, ভীষ্মের মত মৈল,
নাই রোগভোগের যাতনা ॥
কালীনামে সদা ক্ষেপা রামকৃষ্ণ,
পরমহংস কে তা জানে না ?
পৃথ্বীভরি তাঁর কীর্ত্তি লোকে গায়,
—কে বা ভক্তি তাঁকে করে না ॥
ভুলুয়া গায় স্বয়ং কা'ন পূজে কালী,
—কে না পূজে এমন দেখি না ?
(এখন) বাজে লোকের মিছা কথায় কান দেওয়ার
অবসর আর রাখি না ॥

স্বাভাবিক ।

যাচিয়া যে নিজ দুঃখ অন্যকে শুনায়
নিজের গুরুত্ব সেই যাচিয়া খোয়ায়।
পরমেশ ভিন্ন নাই মরমী ধরায় ।
যার যত দুঃখ থাকে জানাও তাঁহায় ।
যে নির্ব্বোধ নিজ গুহ্য অন্যকে শুনায়,
আপনি সে আপনার লাঞ্ছনা বাড়ায় ।
পরনিন্দা পরচর্চ্চা অভ্যাস যাহার,
তার ভাগ্যে বিড়ম্বনা ঘটে অনিবার ?
থাকিতে নিদ্রার রাত্রি দিনে কে ঘুমায় !
—সময় অমূল্য রত্ন ঘুমে কে খোয়ায় !
ঠকাইতে অন্যকে যে হয় যত্নবান্,
আপনি সে ঠকে, ইহা বিধাত্রী বিধান ।
নিরামীষ ভোজী প্রায় দীর্ঘায়ু নিরোগ,
—মিতাহারে ব্রহ্মচর্য্যে নাহি রোগভোগ ।

সুকর্ম্মের সঙ্গী সুখ, সুদীর্ঘ জীবন।
অমর সে,—কর্ম্মধার সংসারে যে জন।
কালে সৃষ্টি কালে স্থিতি কালে হয় শেষ।
—কাল ব্রহ্ম, কাল সত্য, কাল পরমেশ।
কালের অন্তরে শক্তি কালী তার নাম।

সংসারের প্রতি।

হে সংসার ? আমি কেমন তোমার
সে কথা তোমারে কহি।
তোমাকে কহিয়া "আমার আমার"
তাঁহার হইয়া রহি।
তোমার সেবক ভবে সবে জানে,
মাহিনা সে দেয় মোরে।
তুমিও খাটাও সারা দিন রাত,
সে বাহু পশারি ধরে।
তুমি যবে মোকে বিদায় করিবে,
যাব এ বিদেশ ছাড়ি।
তখন তাঁহার করুণায় পাব,
সে দেশে শান্তির বাড়ী।
তোমাকে খাওয়াই, তোমাকে ধোয়াই,
তাঁহারি আদেশ মত।
তাঁহারি আদেশে, এবার তোমার,
হইয়াছি অনুগত।
এখানেও তাঁর করুণা যখন,
তখন বেড়াই সুখে।
এক পল যদি তাঁর নাম ভুলি,
বজর চাপয়ে বুকে।

লোহার শিকলে তুমি ত বান্ধহ,
সে আসি কাটিয়া দেয়।
জোনালে বান্ধিয়া লাঙ্গল টানাও,
সে খুলিয়া নিয়া যায়।
তাঁহার পিরীতি কহিনুর—মতি,
তোমার পিরীতি ছল।
সাগর-মন্থন- সুধা সে আমার,
তুমি হালটের জল।
জানিয়া চিনিয়া রে গৃহ-সংসার!
তবু যে তোমার রহি,
ভুলুয়া ভণয়ে সে কেবল তার;
হুকুম মাথায় বহি॥

ভাবের কথা।

কহিলে ভাবের কথা,
ভাবের ভাবুক না হইলে তাহা
বুঝিবার লোক কোথা?
অপচয়ে, হত- মানে, যে নীরব,
মহাবীর তাকে বলে।
পরবত শিরে বসতি সে করে,
যে ডুবে অগাধ জলে।
প্রভুর উপরে প্রভু যে প্রধান,
অতি পরাধীন সে।
শৃগাল দেখিয়া হটিয়া সে যাবে,
সিংহকে মারিবে যে।

পতির কল্যাণে　　পর-পতি পূজে,
পতিব্রতা সেই বটে।
যত দেব দেবী　　বিরাজে আসিয়া,
তাহার মঙ্গল ঘটে।
ছ'জনের সাথে　　পাঁচজন মিলি
ডাকাতি করিতে চায়,
রাজার দুয়ারে　　সরবস দিয়া,
চতুর বাঁচিয়া যায়।
সতীর সহিত,　　শিবের বসতি,
সীতার সহিত রাম।
কেমন সে প্রেম　　মরণ যাহার
হয় শেষ পরিণাম।
উলঙ্গ হইতে　　সরম না করে,
রাক্ষি যে না খায় ভাত।
ভুলুয়া ভণয়ে　　এ কথা বুঝিতে—
তাহারি কেবল হাত॥

সাবধান।

যা কর তা কর ভাই!
জল ঢালি আগে　　শীতল করিহ,
ঘরের কোণের ছাই।
কুমীরের পথ　　বন্ধ করহ—
খাল কাটিবার আগে—
দুখের সাগরে　　সাঁতার না শিখি,
মজিওনা অনুরাগে।

টাকা ধার দিয়া তার পাছে পাছে,
ঘুরিওনা তুমি আর।
ঘোলের আশায় দুধ বিলাইয়া,
পাস্তা কর'না সার।
চোরের সহিত মিতালী করিলে
চুরি না করিয়া চোর।
মরণে রেহাই সেই ভূত পায়,
যার নাই যত "মোর"।
এক গাছে বাস করে ছয় ভূত,
তার তলে কেন যাও,
ভুলুয়া ভণয়ে পার না হইয়া,
ডুবাওনা কেহ নাও।

সঙ্গগুণ সর্ব্বদা কৃতকার্য্য নহে।

কর্কশ কঙ্কর সিন্ধুনীর মধ্যে রহি
নাহি হয় সিক্ত কোন দিন।
নির্জ্জীব নীরস বৃক্ষ শির নত করি
নাহি হয় নম্রতা অধীন।
সঙ্গ দূরে, জলৌকা বসিয়া পুণ্যদেহে
সচ্ছন্দ্যে চুষিয়া রক্ত খায়।
কিন্তু তবু জোঁকত্ব তেয়াগী পুণ্যসঙ্গে,
পুণ্যপথে কভুও না যায়।
পতিতপাবনী গঙ্গানীরে নিত্য ডুবি,
হিংসা পাপ না ছাড়ে ধীবর।

যত মৎস্য মারে তত আনন্দ তাহার,
না হয় সে পবিত্র অন্তর !
সাধুগণ মধ্যে বসি অনত্র দাম্ভিক,
অপরাধ সঞ্চয়ে কেবল,
তাহাপেক্ষা দূরে যদি রহিত ভুলুয়া,
লভিত অনেক সুমঙ্গল।

অনুভব।

সন্দেশের দোকানে বসিয়া টুল পাতি
কেবল সে কুণ্ডুর নিকটে,
কোন্ সন্দেশের কত দাম বার বার,
জিজ্ঞাসিলে কার তৃপ্তি ঘটে।
মূল্য দিয়া সন্দেশ কিনিয়া মুখে দেও,
কর তার রস আস্বাদন,
যুক্তি তর্ক ছাড়ি কর বিশ্বাস ঈশ্বরে,
অনুভব কর সে কেমন।
ধর সত্য, সরলতা, অহিংসা সংযম,
কর কার্য্য সাধকের মত,
সাধনার কি প্রভাব কর অনুভব,
কেন ভ্রান্ত ভুলুয়ার মত ?

মুগ্ধ।

নিত্য মরণ পথে, শমনানুচর যত,
পশ্চাতে রহি মোরে টানে।
দিন দিন কলেবর হীন-শকতি-গতি,
মন তবু নাহি অবধানে ॥

ডুবু ডুবু তরণী, কাল-সাগর জলে,
কাঁহা কূল নাহি তাহা জানে।
কুম্ভীর হাঙ্গর চৌদিকে শির তুলি
নাচি নাচি চাহে মোর পানে।
আত্মীয় বান্ধব সাধু গুরু সজ্জন
কহি কত মোরে সাবধানে।
হেরি মোর দুর্গতি দুর্গতিহারিণী
শূন্যে আঙ্গুলি আহবানে।
কিন্তু বোধহীন এতই এ ভুলুয়া
নাহি চাহে তা সবার পানে
আসন্ন কাল এবে, তবুও ইতর মতি,
মোহিত মায়াবিনী-গানে।

ভ্রান্তি।

কর্কশ কঙ্কর চবর্বণে সুন্দর,
আগ্রহ মোর অবিরাম।
দন্ত জিহ্বা গেল কণ্ঠ ছিন্ন ভেল,
রুদ্ধ রহল স্বরগ্রাম।
সম্মুখে রক্ষিত অমৃত মজ্জিত,
বিশ্বমোহন হরিনাম।
সজ্জন মানব যত্নে ধরল মুখে,
চিত্ত রহল তাহে বাম।
কঙ্কর ভোজনে এ জনম অবসান।
মন্দ ভাল এত হাম।
স্বর্গ দুয়ারে আসি, বর্গ কুহকে ভুলি,
ফিরিয়া চলিনু পাপ ঠাম॥

প্রশ্ন।

সংসার সঙ্কটে বি[illegible] :
অন্নশূন্য অবসন্ন।
বিপন্নপালিনি! অন্নপূর্ণে, তোমা
তাই ডাকি নিষ্কৃতি জন্য॥
দীনার্ত্তিহারিণি! দৈন্য বিনাশিতে,
অন্য কে আছে তোমা ভিন্ন।
বিশ্বে নিঃস্ব যত বিশ্বাসি তাই তোমা,
আশ্বাসিত;—নহে খিন্ন।
হে বিশ্বজননি! বিশ্বপালনী তুমি।
বিশ্বের (ই) মূর্ত্তি;—নহি অন্য।
নিঃস্ব বলিয়া যদি, ভুলুণ্ঠায় পরিহর,
গৌরবে কে করিবে গণ্য॥

উৎসাহ।

কেন মন, চিন্তাপরায়ণ?
নিরাশ্রয় নও তুমি, যিনি ত্রিজগত স্বামী
ধর তাঁর অভয় চরণ॥

তিনি তব পরম আশ্রয়।
ধরিয়াছে যে তাহারে, বিঘ্নময় এ সংসারে,
কভু তার নাহি পরাজয়॥

বিপদ বর্ষুক শতধারে,
বৃষ্টি নামি শতধারে, পর্ব্বতের কলেবরে,
কি অনিষ্ট সাধিবারে পারে॥

পরমেশ পরম আশ্রয়।

নদীর সমুদ্র যথা, ভক্তে ভাগবত কথা,

ভাস্কর জ্যোতির যথা হয়॥

তাঁয় করে যে অবলম্বন,

নাহি নাহি ধ্বংস তার, অক্ষয় অমৃত-ধার,

তার অধিকারে অনুক্ষণ॥

সর্ব্বদর্শী সে করুণাধার

প্লাবনে ভাসুক দেশ, বহ্নিতে পুড়ুক শেষ,

ভুলুয়া অদৃশ্যে নাহি তাঁর।

অসাধ্য।

কার সাধ্য হস্ত পদে করি সন্তরণ

কূলহীন মহাসিন্ধু তরে?

কার সাধ্য বিদ্যা বুদ্ধি কৌশল করিয়া,

বাধ্য করে পরম ঈশ্বরে?

কার সাধ্য প্রেম ভিন্ন, করি অত্যাচার,

বশীভূত রাখিতে অন্যকে?

বলে বাধ্য অবসর পাইলে যা করে,

প্রতিকারী তাহার জন্য কে?

কার সাধ্য গুণীর গৌরব বিনাশিতে,

রটাইয়া নিন্দা অপবাদ,

কার সাধ্য দীর্ঘজীবী রহিতে ভূতলে,

নিত্য করি লোক সঙ্গে বাদ

কার সাধ্য নিষেধিয়া নিরস্ত করিতে
সজ্জনের প্রতি অনুরাগ ?
কার সাধ্য দণ্ড বিনা উপদেশ দিয়া
শান্ত করে নির্ব্বোধের রাগ ?
কার সাধ্য কৃপণ দুর্জ্জন বিষয়ীকে
মন্ত্রবলে ধর্ম্মপথে আনে ;
কার সাধ্য "জীবে দয়া" ধর্ম্ম বুঝাইতে
মাংসপ্রিয় মানুষের প্রাণে ।
কার সাধ্য স্পর্শ করে ছল বল করি,
পুণ্য তনু সতী অঙ্গনার ?
কার সাধ্য যোগভঙ্গ করে তপস্বীর,
দৃঢ়চিত্তে সত্যব্রত যাঁর !
কার সাধ্য বিপন্ন করিতে তাঁকে পারে,
চিত্ত যাঁর ঈশ্বরে ধেয়ায় ।
ভুলুয়া জিজ্ঞাসে তাকে মারিতে কে পারে,
ঈশ-নাম যাঁর রসনায় ।

মূর্খ পুত্র ।

পুত্র যদি নাহি জন্মে নাহি দুঃখ তায়,
জননীর যাতনা না হয় !
জন্মিয়াই মরিলেও তাহাও মঙ্গল,
শোকে মগ্ন কিছুদিন রয় ।
কিন্তু যদি হয় পুত্র মূর্খ অভাজন,
জ্বালাতন করে চিরকাল,

সংসার পোড়ায়, জ্বালি বহ্নি অশান্তির ;
পদে পদে বাধায় জঞ্জাল।
যত্নে পুষি গাভী যদি দুগ্ধ নাহি পাই,
তাহা বৃথা উৎপাত যেমন,
রত্ন আনি দেখি যদি কাচ খণ্ড তাহা,
তাতে ক্ষুব্ধ যথা হয় মন,
তথা কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুব্ধ চিত্ত হয়,
হলে পুত্র মর্খ অভাজন।
ভুলুয়াও কহে "পুত্রে সুশিক্ষা না দিলে,
হয় তাহা শত্রুতা সাধন"।

যে গৃহে সন্তান নাই তাহা এক শূন্য,
আর শূন্য বন্ধুহীন দেশ ;
আর শূন্য জ্ঞানহীন মূর্খের হৃদয়,
মহেশে যে গণ্য করে মেষ !
আর এক শূন্য ঐ দরিদ্রের গৃহ,
দিনেও যেখানে অন্ধকার।
আর শূন্য মন প্রাণ এ আর্য্যনগরে,
আশ্রয়বিহীন ললনার।
আর শূন্য পিতৃমাতৃহীন অসহায়,
শিশুর সম্মুখে এ সংসার।
ভুলুয়া কহিল "বিভু-ভক্তিহীন মন,
শূন্য নাই তার তুল্য আর।"

রোগের দোষ নাহি।

নিমন্ত্রণ করি রোগ আনে সে শরীরে,
　　অতিমাত্রা যে করে ভোজন।
পরায় রোগের হার অঙ্গে সে জননী,
　　সন্তানে যে খাওয়ায় তেমন॥
উপযুক্ত আহার না করি, অনাহারে
　　করে যারা, ক্ষুধানলে কায়
ধীরে ধীরে দগ্ধ করি, অকালে জীবন
　　নানা রোগে তাহারা হারায়॥
অতিমাত্রা জলপান করয়ে যাহারা,
　　রোগে তারা যত্ন করি ডাকে।
রাত্রি জাগি দিনে যারা ঘুমায়, তাহারা
　　রোগের দুয়ার খুলি রাখে॥
মল-মূত্র-বেগ যারা করয়ে ধারণ
　　রোগের চরণে তারা পড়ে।
ভুলুয়া পরখি কহে অকর্ম্মা অলস
　　দুঃখ রোগ ছাড়ি নাহি নড়ে॥

সাধুসঙ্গের মহিমা।

মরুতুল্য এ সংসার　　　বিষবহ্নি মধ্যে তার,
　　প্রবাহিত মৃদুল হিল্লোলে।
সংসার পথের পান্থ　　　পথশ্রমে একে শ্রান্ত,
　　তাহে দহে সেই বিষানলে।
জুড়াইতে স্থান নাই　　　বুঝেনা কোথায় যাই,
　　যন্ত্রণায় অবসন্ন প্রাণ,

ভুলুয়া ডাকিয়া কহে যদি সাধুসঙ্গে রহে,
পলে দুঃখ হবে অবসান ;

অসম্ভবে সম্ভব।

অসম্ভব এমন রসনা এ সংসারে,
বলে নাই মিথ্যা একদিন।
হয় নাই কলঙ্কিত কর্কশ ভাষণে,
আর পরনিন্দা-চর্চ্চাহীন।
কিংবা নাহি উচ্চারিল ঈশ্বরের নাম,
না করিল স্নেহ-সম্ভাষণ,
না হইল অগ্রবর্ত্তী সজ্জনের মত
করিতে সত্যের সমর্থন।
ভুলুয়া উত্তরে যারা জন্মিয়াই মরে,
কিংবা মূক জন্মাবধি হয়,
তাহাদের রসনায় সম্ভবে এ সব,
অন্যথায় মনুষ্য সে নয়॥

দৈব বিড়ম্বনা।

ভবিষ্যতে সচ্ছন্দে রহিবে আশা করি,
গোয়ালন্দে দুর্গানাথ সিংহ,
পঞ্চাশহাজার টাকা রাখিল ষ্টিমারে,
অন্য কত ইংরেজের সহ।
চোরে কিংবা তস্করে তা হরিতে নারিত,
নির্ভাবনা ছিল মনে মনে,

কিন্তু তেরশত ষোল আশ্বিনের ঝড়ে
 ষ্টিমার পদ্মায় নিমগনে।
করিল অর্জ্জন যাহা জীবন ভরিয়া
 বিসর্জ্জিল পদ্মার জীবনে।
অর্থশোক বজ্রসম অন্তরে বাজিল,
 পক্ষাঘাতে হারা'ল জীবনে ॥

ভট্টাচার্য্য তারিণী ভিজিয়া বৃষ্টি-জলে
 দিবা রাত্রি করি পরিশ্রম,
নির্ম্মিল সুরম্য গৃহ মধুমক্ষী যেন,
 রচিল অপূর্ব্ব মধুক্রম।
ভবিষ্যতে বৃষ্টিপাতে হইল নির্ভয়,
 কিন্তু কাল বৈশাখের শেসে,
অগ্নিতে পুড়িল গৃহ ; ভট্টাচার্য্য দেশ
 তেয়াগিল অতি মনোক্লেশে ॥

রাজা সে গোবিন্দলাল ছিল রংপুরে,
 ইচ্ছে সুখে ভবিষ্যতে বাস,
গড়িল উত্তম হর্ম্ম্য বহু দিন ভরি,
 সঞ্চিত সম্পত্তি করি নাশ।
তেরশত চারি সালে ভূমিকম্প এল,
 ভূমিসাথ হ'ল নিকেতন,
ভবিষ্যতে বাসের বাসনা হ'ল দূর,
 উরু ভাঙ্গি হারাল জীবন ॥

পরমান্ন পলান্ন খাইব কাল, ভাবি,
 আজ ঘৃত দুগ্ধ কিনিলাম,

রাত্রিশেষে মা মরিল সর্পের দংশনে,
কাঁদিয়া হবিষ্য করিলাম।
আজীবন কষ্টে অর্জ্জি দু'হাজার টাকা
রাখে রাম মধুর নিকটে;
পত্নী সহ মধু তা করিল অস্বীকার,
চাহিল সে যখন সঙ্কটে॥

চারি বর্ষ দূর দেশে দাসত্ব করিয়া,
প্রাণপ্রিয়তমা পত্নী তরে,
কিনি বস্ত্র অলঙ্কার প্রেমিক যুবক,
উল্লাসে চলিল নিজ ঘরে;
চলে পথে, আর ভাবে, "দাসত্বের ক্লেশ
জুড়াইব তাকে অঙ্কে নিয়া"।
আশায় আসিয়া বাড়ী দেখে অন্ধকার,
প্রিয়তমা গিয়াছে মরিয়া॥

তাই বলি ভবিষ্যতে কালস্রোতে কার
কপালে কি আছে কে বলিবে।
তবু ভবিষ্যৎ মোহে উন্মত্ত মানব,
গম্য পথ ফেলিয়া চলিবে।
কত দৈব বিড়ম্বনা সম্মুখে বিরাজে,
গণ্য কে করিতে তাহা পারে।
দুর্গতির জন্য রহ সর্ব্বদা প্রস্তুত,
সুখ যদি হয় হ'বে পরে।
তুমি আমি চন্দ্র সূর্য্য যাঁহার ইচ্ছায়,
যাঁহার ইচ্ছায় বিশ্বধাম।

তাঁহার চরণে সর্ব্ব আশা বলি দিয়া,
স্মররে ভুলুয়া তাঁর নাম ॥

অনুতাপ।

কত কত রত্ন চরণে দলিয়া,
যত্নে রাখিয়াছি কাচ।
কত কত দিব্য অভিনয় হেলি,
দেখিয়াছি ভল্লু নাচ।
কত কত সাধু সিদ্ধ মহাজনে,
দুর্জ্জনের কথা শুনিয়া,
কত কত দিন কর্কশ ভাষণে,
দিয়াছি ধাক্কা মারিয়া।
কত কত মন্দ কর্ম্ম করিয়াছি,
সন্দেহ না করি মনে,
কত কত ধর্ম্ম সন্দেহ করিয়া,
দলিয়াছি দু'চরণে।
কত কত মন্দ পথে হাটিয়াছি,
নিষেধ না করি গ্রাহ্য।
কত কত পূজ্য পথ ছাড়িয়াছি,
সৌন্দর্য্য না দেখি বাহ্য।
কত কত স্থানে নিজ উপদেশ,
নিজে করিয়াছি ভঙ্গ।
কত কত ধীর মোহান্তে না চিনি,
কত করিয়াছি ব্যঙ্গ।

কত কত স্থানে মহামান্ত জনে,
করিয়াছি হীনে গণ্য
কত কত দিন ধরেছি নিশান,
হীন নরাধম জন্য।
কত কত দিন বৃথা অহঙ্কারে,
নির্দ্দোষে করেছি দণ্ড।
কত কত দিন শির নত করি,
অর্চ্চিয়াছি পাপ-ভণ্ড।
সুমঙ্গলময় জনক আমার
তাঁকে বলিয়াছি উচ্চ।
আমা ভিন্ন যেই মা নাহি জানিত,
করিয়াছি তাঁকে তুচ্ছ।
কত দিন কত সুবর্ণ সুযোগ
পাইয়াও ধরি নাই।
কত দিন বাঞ্ছা পাইব আশায়
ঘাটিয়াছি শুধু ছাই।
এতই অধর্ম্ম এতই অকর্ম্ম,
করিয়া গিয়েছে দিন।
এবে সন্ধ্যাকালে বিভু কৃপা চায়,
ভুলুয়া কি লজ্জাহীন!!

নিরলাজ।

লভি উচ্চপদ দু'দিনের জন্য
সম্মানী জনে ধরিয়া,
দেখায়েছি মোর প্রভুত্ব কিরূপ
লাঞ্ছনা-গৃহে ভরিয়া।

পুনঃ যবে আমি সে পদে বিচ্যুত—
ইতরের গৃহে আসিয়া,
তামাকু একটু মাঙ্গি আনিয়াছি,
কত ধর্ম্ম-বাপ বলিয়া।
যখন যাহার দেখিয়াছি জয়,
তখন তাহার হইয়া,
বক্তৃতা কত করিয়াছি আমি,
কত উচ্চ গলা করিয়া।
পরদিন যদি বুঝিয়াছি গোল,
নাকে খত দিয়া বলেছি ;
"এমন করম আর করিব না,
সন্ন্যাসী হ'তে চলেছি।"
এই ত আমার জীবনের কথা,
এই ত আমার পরিচয়।
ভুলুয়াও কহে, "আমার মতন
নিরলাজ আর কোথা রয়" ॥

সাধুসঙ্গেও বিড়ম্বনা ঘটে।

শুনি সাধুসঙ্গের মহিমা সর্ব্ব ঠাঁই,
যাতায়াত করি মঠে মঠে,
যুক্তি তর্ক বিস্তারিয়া বিদ্যা পরিচয়,
দিতে বসি সাধুর নিকটে।
শিখিতে না চাই, শিক্ষা দিতে যাই তাঁরে,
দেখি সাধু স্বভাব আমার

"উত্তম উত্তম" বলি করেন বিদায় ;
ফিরে গিয়া দেখি রুদ্ধ দ্বার।
বহু তীর্থ পর্য্যটন বহু সাধুসঙ্গ,
হেন ভাবে আমি করিয়াছি।
জাহ্নবার তীরে আসি স্নান না করিয়া
ধূলা ঝাড়ি ফিরি আসিয়াছি।
ভুলুয়া উত্তরে, সাধুসঙ্গে বসি শুধু
বাক্যব্যয়ে কোন লভ্য নাই।
নমস্কার সেবা পরিচর্য্যা না করিলে,
সাধুকে প্রসন্ন কোথা পাই॥

গরিষ্ঠ ছাত্র।

গরিষ্ঠ বিদ্যার্থী সেই ছাত্র বিদ্যালয়ে,
প্রত্যুষে যে উত্থান করিয়া,
সকলের অগ্রে নিজ প্রাতঃকৃত্য করে,
উৎসাহে আলস্য তেয়াগিয়া।
নিদ্রার কি সাধ্য তাকে বন্ধে বিছানায়,
তার অধ্যবসায় স্বতন্ত্র।
অদম্য উৎসাহ তার বিদ্যা অধ্যয়নে।
বিজ্ঞাত সে বিদ্যাপূজা মন্ত্র।
প্রাতঃকৃত্য সমাপিয়া জড়ত্ব নাশিতে,
সেবনে সে বিশুদ্ধ বাতাস।
তারপরে গ্রন্থ নিয়া বসে অধ্যয়নে,
যাহে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ।

অধ্যয়ন সময়ে সে অন্য সঙ্গে কথা
নাহি বলে—ধীর মনযোগী,
সময় নির্দ্দিষ্ট তার সমস্ত কর্ম্মে,
বিনয়ী সে, ধর্ম্মে অনুরাগী।
পিতা, মাতা, গুরুগণে অবাধ্য সে নহে ;
উপদেশ যত্নে মনে রাখে।
ভোজন সময়ে তার নাহি গণ্ডগোল,
সর্ব্বদা সে সভ্য শান্ত থাকে।
মিথ্যাকথা পরনিন্দা করা দূরে থাক,
শুনাইলে না করে শ্রবণ ;
বৃথা তর্ক কলহে প্রবৃত্ত নাহি হয়,
না উচ্চারে অশ্লীল বচন।
উত্তম চরিত্রে প্রিয়পাত্র সে সর্ব্বত্রে,
পিতৃমাতৃপদে ভক্তিমান।
ভুলুয়া গণিয়া কহে গরিষ্ঠ সে ছাত্র,
কালে হবে মহা যশস্বান।

বক্তৃতা অপেক্ষা আচরণে অধিক কার্য্য হয়।

পিঞ্জরে বসিয়া পাখী "হরিবোল" বলে
তাহা নহে নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
শেখা বুলি বলে মাত্র, উপলব্ধি নাই,
তাই তাহা না পরশে মন।
গ্রন্থ অধ্যয়ন করি তথা সভাতলে,
যারা তত্ত্ব করে উদগীরণ,
অল্পজ্ঞান নরে তাহা শুনে হা করিয়া,
জ্ঞানী গণ্যে গিলিত চর্ব্বণ।

গ্রন্থে যাহা পড়, যদি কর আচরণ,
থির সত্য তা হ'লে বুঝিবে।
সেই সত্য যবে তুমি করিবে কীর্ত্তন,
লোকে তাহা যত্নে গ্রহণিবে।
মুখস্থ বিদ্যায় আর পরের কথায়,
যে জ্ঞান—সে জ্ঞান সত্য নয়,
জলদে নির্ম্মিত মূর্ত্তি আকাশের গায়,
কতক্ষণ এক ভাবে রয়।
"সত্য কথা বলা শ্রেয়" বলি বার বার,
বহু লেখকের বাক্য তুলি,
বক্তৃতা করিনু, কিন্তু আমি সারাদিন
কোন সত্য না বলিনু ভুলি।
ভাষার ছটায় আর ভাবের ঘটায়,
মুগ্ধ করি শ্রোতার শ্রবণ,
মুখস্থ করিয়া বক্তা যাত্রার নারদ,
তার শিষ্য কে হয় কখন?
সর্ব্ব স্বার্থ করি ত্যাগ সন্ন্যাসী হইল,
আচণ্ডালে কোলে তুলি নিল,
তাই ত চৈতন্য নামে পাগল হইয়া,
সর্ব্ব জাতি পদে বিকাইল।
নিষ্কিঞ্চন মহীয়ান স্থির ব্রহ্মচারী
আমার শ্রীচৈতন্য গোঁসাই।
আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়
অশ্রুপাত ভিন্ন কথা নাই।
অতএব কোন ধর্ম্ম বক্তৃতার নহে
আচরিয়া জগতে শিখাও।

হেরিলে গুরুর ত্যাগ শিষ্য ত্যাগী হবে,
ভুলুয়ারে কি হেতু চেঁচাও।

মনের মধ্যে সমস্ত।

ডাকে পাখী বিটপীর শাখায় বসিয়া,
ললিত পঞ্চম তানে সুধা বরষিয়া।
বিরহী সে ডাক শুনি মরে মনদুখে,
স্মরণ করিয়া তার পুরাতন সুখে।
দম্পতী নির্জ্জনে তাহা করিয়া শ্রবণ,
দোঁহে দোহ মুখ চাহি আনন্দে মগন।
এক শব্দে এক স্থানে দুই বিপরীত
ভাব ঘটে, শব্দের কি আশ্চর্য্য চরিত।
ভুলুয়া উত্তরে নহে শব্দের স্বভাব,
যার মন যেমন, তাহার সেই ভাব।

কুসঙ্গে পড়িলেও সিদ্ধ মহাপুরুষের পতন ঘটে না।

মাতৃগর্ভে সন্তান বিরাজে দশমাস,
কিন্তু ভুক্ত অন্নাদি মতন,
কভু নাহি জীর্ণ হয়; তথা যে সজ্জন,
হীন সঙ্গে নহে হীন মন।
—নহে দগ্ধ স্বামিত্ব তাহার।
রহিলে হীরক খণ্ড লবণের খাদে,
ভুলুয়ারে ক্ষয় কোথা তার?

আপন মনে।

মানুষ করিয়া সংসারে আনিয়া
কত আশীর্ব্বাদ করিল।
সুকর্ম্মে সুযোগ, অত্যুচ্চ সম্মান,
সম্মুখে কত ধরিল।
আমি তা সকল গ্রাহ্য না করিয়া
কি মোহে মাতিয়া রহিলাম,
সন্ধ্যা যে আসিল, অন্ধ সম আমি,
দেখিয়া না তাহা দেখিলাম।
সারা দিন ঘুরি, মোহের কুহকে
এবে অবসান সময়ে,
দয়া কর বলি, ডাকিলে কি আর,
দয়া হয় তাঁর হৃদয়ে।
হায় কি ভ্রান্ত ভুলুয়া!
অসময়ে তার, সহায় যে জন,
তাঁহাকে রহিল ভুলিয়া।

স্বভাব।

কর্কশ কঙ্কর সিন্ধুনীরে বারমাস,
রহিয়াও সিক্ত নাহি হয়।
দয়াময় বিশ্বনাথ শিরে বাস করি
সর্প কভু নহে প্রেমময়।
দন্তহীন হইলেও দুরন্ত শার্দ্দূল,
নাহি করে মাংসাহার ত্যাগ,

রহিলেও ক্ষমাময় সক্রেটিশ সঙ্গে
জেন্থিপীর নাহি যায় রাগ।
সাধুসঙ্গে রহিলেও পাষণ্ড দাম্ভিক
নাহি ছাড়ে ধৃষ্টতা তাহার।
রহিলেও নিত্যসুখে জননী কৃপায়,
কৃতজ্ঞতা নাহি ভুলুয়ার।

প্রশ্নোত্তর।

ঈশ্বরের করুণায় কার অধিকার?
ভ্রমেও পরের হিংসা মনে নাহি যার।
শত্রুহীন কোন জন কে পার বলিতে?
হিংসাদ্বেষ বিবর্জ্জিত যে জন মহীতে।
কীর্ত্তির পতাকা স্থির এ ভূতলে কার?
জীবন উপেখি সত্য পালিত যাহার।
শ্রদ্ধার আসনে উপবিষ্ট কোন্ জন?
মত পরিবর্ত্তন যে না করে কখন।
কোন্ ব্যক্তি সুখে করে জীবন যাপন?
নিজ কর্ম্মে সাধে যে নিজের প্রয়োজন।
ভুজঙ্গের বিষাপেক্ষা তীব্র কোন্ বিষ?
বাসনা,—যা এই বিশ্ব দহে অহর্নিশ।
কালানলে কাহারা না হয় দহ্যমান?
সে পরম ঈশ্বরে যাহারা ভক্তিমান।
পুত্রশোকে তপ্ত নহে কাহার হৃদয়?
ঈশ্বরে নির্ভরশীল সর্ব্বদা যে রয়।
আদর সম্মান কার জন্য ঘরে ঘরে?
নিজে কষ্ট সহিয়া, যে পর-সেবা করে।

অশান্তির নিকেতন বল কোন্ স্থান ?
যথা আনুগত্য নাই সবাই প্রধান।
প্রার্থনা করিতে পার কার উপকার ?
মনে প্রাণে হইয়াছে অনুগত যার।
কোন্ পুত্র হয় বিদ্যাসাগর ঈশ্বর ?
জননীর পদে যার অনন্য অন্তর।
কার ভাই বৈরীর পাদুকা বহি যায় ?
যার ভাই, ভাই ছাড়ে পর-প্রত্যাশায়।
দস্যু আসি কোথা ঘর দিনে লুট করে ?
কলহ যথায় সহোদর সহোদরে।
গচ্ছিত সম্পদে করে বঞ্চিত কাহাকে ?
লুকাইয়া অর্থ যে পরের হাতে রাখে।
উৎসন্ন হইয়া কারা সর্বস্ব হারায় ?
জ্ঞাতি জনে বঞ্চিত করিতে যারা যায়।
ধন, মান, প্রাণ কার যায় পরে পরে ?
আত্মীয় খেদাড়ি, ঘরে যে বসায় পরে।
স্বজন করিতে শত্রু বেশী শক্তি কার ?
রসনায় বচনের দোষ বেশী যার।
এ সংসারে সুযোগের দস্যু কোন্ জন ?
বিবাহে শ্বশুর গৃহ যে করে লুণ্ঠন।
মরণের ভয়ে ভীত নহে কোন্ জন ?
ভুলুয়া ত কহে, "বিশ্বনাথে যার মন।"

জড়ের দেশে স্বজাতির শত্রু স্বজাতি।
কুঠারে জিজ্ঞাসে তরু, "তুমি ভিন্ন জাতি,
লৌহ তুমি আমি কাষ্ঠ হই ;

ভূগর্ভে খনির মধ্যে বসতি তোমার,
আমি এই বন মধ্যে রই।
বিধাতৃবিধানে তুমি সুদৃঢ় শরীর,
সর্ব্ব গর্ব্ব চূর্ণ তব ঠাঁই,
আমি হীন দুর্ব্বল তোমার কৃপাপাত্র,
তব সঙ্গে বৈর মোর নাই।
ক্ষেত্র, যোত্র, ভার্য্যা দেখ উভয়ের দেশে
ভিন্ন ভিন্ন; তব সঙ্গে মোর,
তা সবার জন্য নাহি মালিন্য সম্ভবে,
তবু কি নিমিত্ত তুমি, ঘোর
হিংসায় জ্বলিয়া কর মোর মূলোচ্ছেদ,
কর সদা নির্দ্দয়াচরণ?"
উত্তরে কুঠার, "ভদ্র, কি দোষ আমার?
তোমার স্বজাতি একজন,
রহিয়া আমার সঙ্গে, দিয়া কুমন্ত্রণা,
করায় যেমন কর্ম্ম, করি—
আমি শত্রু নই তব মূলোচ্ছেদ তরে,
বৃথা কেন নিন্দ মোকে ধরি?
তোমার স্বজাতি যদি মোর সঙ্গ ছাড়ে
তব নাশে কি সাধ্য আমার?
—নাশ দূরে,—উঠিয়া যে দাঁড়াইব আমি
বিন্দুমাত্র সাধ্য নাহি তার।
তোমার যথার্থ শত্রু স্বজাতি তোমার,
তাহাকে করহ সাবধান।"
ভুলুয়াও কহে, "লঙ্কেশ্বর কোথা মরে,
বিভীষণ না দিলে সন্ধান!

দর্শনের উপায়।

এ তিন ভুবনে যা আছে, নয়নে
সকলই দেখিতে পাই।
কিন্তু কি বলিব, আপন বদন,
দেখার উপায় নাই।
পাহাড় পর্ব্বত, সাগর প্রান্তর,
কত কি দেখিতে পারি।
কিন্তু যে বিরাজে, অন্তরে বাহিরে,
তাহাকে দেখিতে নারি।
ভুলুয়া ইসারে, ধরি দরপণ,
নিরখ আপন মুখ।
আর দিব্য-চক্ষু মেলি পরমেশে,
নিরখি ঘুচাও দুখ॥

পশুবলের গৌরব নাই।

হস্তী তুল্য বলশালী কোন্ জন্তু আছে,
ভীষণ কে সর্পের মতন,
পক্ষী তুল্য মুক্ত কে বা আছে মহীতলে,
তবু তারা সহয়ে বন্ধন।
বুদ্ধি বল বড় বল, আর সর্ব্বোপরি
বল হয় তপস্যার বল,
যে বলের সন্নিকটে চূর্ণ সর্ব্ব বল,
বদ্ধ রহে ইঞ্জিনের কল।
সম্পদ প্রভুত্ব বলে না করি বিশ্বাস,
তার সাক্ষী রুশিয়ার জার,

হইয়া সম্রাটশ্রেষ্ঠ হারাইল প্রাণ,
সহি একশেষ লাঞ্ছনায়।
তাই বলি যত দর্প দেখি পশুবলে,
মিথ্যা সব কালের নিকটে।
ভুলুয়া জিজ্ঞাসে, "কাল কি করিবে তার,
কালীনাম যার চিত্তপটে"।

ব্রহ্মচর্য্যহীন।

কি কহিব দুঃখের কপাল!
অবহেলি ব্রহ্মচর্য্য দেহে শক্তি নাই,
যৌবনে আসিল বৃদ্ধকাল।
এ বিপুল কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মী সুখে রহে,
এ দৃষ্টান্ত দেখি সর্ব্বক্ষণ,
কিন্তু এ দুর্ব্বল মন, কর্ম্ম নিরখিলে,
দূরে দ্রুত করে পলায়ন।
পদমাত্র চলিতে ভাঙ্গিয়া আসে জানু,
তনু গলি বাহিরায় ঘাম,
এ পূর্ণ বয়সে আমি অকর্ম্মা অধম,
সর্ব্ব স্থলে আমার দুর্নাম।
স্ফূর্ত্তিহীন চিত্ত মোর, বিরক্তি সর্ব্বদা,
মনে হয় মোর কেহ নাই,
দুখের সঙ্গীত মোর কিছু তৃপ্তিকর,—
নাহি বুঝি কিসে তৃপ্তি পাই।
কি নিমিত্ত হল মোর দুর্গতি এমন,
কে পারে বলিতে তত্ত্ব তার।

ভুলুয়া উত্তরে, "ঘটে তার(ই) এ দুর্গতি,
ব্রহ্মচর্য্য নাহি থাকে যার" ।

নির্ব্বোধ ।

এক মিথ্যা বলি তাহা ঢাকিবার তরে,
বার বার মিথ্যা কহে যে নির্ব্বোধ নরে,
কপালে লাগিলে কালী,
বোতলের কালী ঢালি,
ধুইতে সে সর্ব্ব অঙ্গ কালীময় করে ।
নির্ব্বোধ কে তার তুল্য এ ভূতলোপরে ?

দশের ঘৃণিত কর্ম্ম করি একবার,
অসহ্য লাঞ্ছনা সহে,
দুর্নামে মরিয়া রহে,
তবু সে ঘৃণিত কর্ম্মে চলে আর বার,
নির্ব্বোধ কে আছে বিশ্বে মতন তাহার ?

আপনার গৃহলক্ষ্মী করি পরিহার,
কুলটার প্রতি চিত্ত আসক্ত যাহার,
সেই ভাগ্যবান ধন্য,
পরিহরি পরমান্ন,
গৌরবে গোবর ছানি করয়ে আহার ।
নির্ব্বোধ সে, দুর্ভাগ্য—তাহার অলঙ্কার ।

আপন ছাড়িয়া, পরে আত্মীয় ভাবিয়া,
সম্বন্ধ পাতায় যারা যতন করিয়া,

ঘরের সন্ধান বলি,
স্বজনে সঙ্কটে ফেলি,
পরের মঙ্গল সাধে নাচিয়া নাচিয়া,
নির্ব্বোধ সে যায় বংশ শুদ্ধ ডুবাইয়া।

শুধু গ্রন্থ পাঠ করি বিদ্বান যে হয়,
শরীরের প্রতি সদা লক্ষ্যহীন রয়,
মুণ্ড তাহা দেহহীন,
প্রতি কর্ম্মে পরাধীন,
নির্ব্বোধ সে, যাহা কিছু উপার্জ্জন তার,
ভৃত্য যত ভাগ করি খায় অনিবার।

অর্থ উপার্জ্জন তরে বাণিজ্য না করি,
প্রাণপণে চেষ্টি যারা হয় কর্ম্মচারী,
দারিদ্র্য তাদের ঘরে,
নির্ভয়ে বসতি করে,
অপথে মরিতে তারা চলে পথ ছাড়ি,
নির্ব্বোধ তাহারা, মোহে ঘুরে বাড়ী বাড়ী।

কত বা শরীর ক্ষয়, অর্থ করি জল,
কত বিদ্যা শিখে, কথা কহিবার কল,
কিন্তু নিত্য-কর্ম্ম যাহা,
নাহি শিক্ষা করে তাহা,
রান্ধিতে না পারি চিড়া ভিজায় কেবল।
নির্ব্বোধ তাহারা, শিক্ষা-বিভাগের-মল।

ইন্দ্রিয়ের সুখাশায় ব্রহ্মচর্য্য ছাড়ে,
নলের মতন ছিদ্র জনমায় হাড়ে ;

সামর্থ্য থাকেনা আর,
হারায় কর্ম্মাধিকার,
যায় শান্তি সন্তোষ, কেবল ক্রোধ বাড়ে !
নির্ব্বোধ সে, মরণের ভূত তার ঘাড়ে।

নীচ স্বার্থ তরে যারা মনুষ্যত্ব ছাড়ি,
কৌশলে পরস্ব নিয়া করে বাড়াবাড়ি,
কাচ হরি, তার ফলে,
কাঞ্চন ভাসায় জলে ;
পুত্রপৌত্র আঁখিজলে ভাসে তার বাড়ী।
নির্ব্বোধ সে, সুধা ফেলি পান করে তাড়ি।

আর সে নির্ব্বোধ, যারা মানুষ হইয়া,
ঊর্দ্ধ-দৃষ্টিহীন রহে বিষয়ে ভুলিয়া ;
ভগবানে ভক্তিহীন,
সম্মুখে শেষের দিন,
চিন্তা নাহি করে, কভু সতর্ক রহিয়া,
মত্ত সম রহে যথা নির্ব্বোধ ভুলুয়া।

বসিরহাটের পরোপকারী,
লোকপ্রিয়, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ,

ভলুয়া বাবা।

ধর্ম্মপ্রাণ নারায়ণপরায়ণ
প্রফেসর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী।

ষষ্ঠ দিন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

হে পর্ব্বত-পঙ্‌ক্তি-পতি-নন্দিনি অন্নপূর্ণে !
শারদোজ্জ্বল চন্দ্রকান্তি পরিমণ্ডিত স্বর্ণবর্ণে !
হে মেনকাঙ্কোজ্জ্বলভূষণে, মে শরণ্যে
দারিদ্র্য দুঃখ দহনাজ্জগদম্বে রক্ষ ॥১।

কহে বৃদ্ধ রত্নগিরি, "বহু তত্ত্ব শুনি,
পরানন্দে গত প্রায় মাস।
সাধুসঙ্গ মহিমার সাক্ষী অতুলন,
প্রত্যক্ষে দেখিনু পরকাশ।
আগমনী শ্রবণে বাসনা সকলের ;—

১। হে পর্ব্বতশ্রেণীর রাজনন্দিনি অন্নপূর্ণে! হে শারদীয় উজ্জ্বল চন্দ্রের কান্তিমণ্ডিত কাঞ্চনবর্ণে! হে মেনকার অঙ্কের উজ্জ্বল ভূষণে! আমি তোমার শরণাগত। হে জগদম্বে! কঠোর দারিদ্র্য দুঃখানল হইতে আমাকে রক্ষা কর।

জগজ্জননী দশভুজা,
মেনকা-মন্দিরে উদি, উমা রূপ ধরি,
নিরখেন বাৎসল্যের পুজা।"
বিষ্ণুদাস কহে, "লীলা-কীর্ত্তনের তুল্য
আর নাহি মধুর কীর্ত্তন।"
সবিনয়ে সন্তান ধরিয়া এক গ্রন্থ,
আগমনী করে অধ্যয়ন।

মঙ্গলাচরণ।

খাম্বাজ—চৌতাল।

দেব-দেব মহাদেব অনাদিনাথ মহেশ্বর।
বিশ্ববন্দ্য বিশ্বনাথ বিশ্বরূপ বিশ্বম্ভর॥
চন্দ্র-ভাল মদন-কাল,
ত্রিশূলপাণি ভূজগমাল।
লোকনাথ কাঙ্গালবন্ধু অনাথনাথ গৌরীবর॥
ব্যোমকেশ বৃষভযান,
কাশীপুর-বাসি-প্রাণ।
প্রমথনাথ নন্দীকেশ গণেশপাল গঙ্গাধর॥
নীলকণ্ঠ পঞ্চবদন,
নিঃস্বনাথ ভস্মভূষণ।
ধূর্জটি পশুপতিনাথ চন্দ্রনাথ বিঘ্নহর॥
ত্রিপুরনাম দৈত্যবৈরী,
ত্রিদিবকান্ত ত্রিতাপহারী।
ত্র্যম্বক শিঙ্গাডুমুরধারী শঙ্কর হর দিগম্বর॥

আশুতোষ দীনবন্ধু,
বিশ্বপালক করুণাসিন্ধু,
ভুলুয়া-ভয়-পারাবার-পার-তরণী-কর্ণধার।

আগমনী।

গত ভাদর বারিধারা,　　সুনীলাকাশে হাসে তারা,
ঘনকোলে বলাকা ঘন উড়ে।
সরোজ সাজায় সরসীরে,　　প্রবাহিনী পূর্ণা নীরে,
আনন্দের প্রবাহ বিশ্ব জুড়ে॥
কেবল শোভাবর্দ্ধন তরে,　　গগনে ঘন বিরাজ করে,
পলে পলে নূতন নূতন বর্ণ।
স্থির বিটপীর ডালে বসি,　　বিহগ থিরানন্দে ভাসি
ললিত পঞ্চমে জুড়ায় কর্ণ॥
স্বচ্ছল সচল জলে,　　সর্ব্বত্র তরণী চলে,
উল্লাসে নাবিকে করে গান।
শ্যামল পরিচ্ছদ পরি　　নয়ন মন মুগ্ধ করি,
প্রকৃতি করয়ে প্রীতি দান॥
দিন নহে দীর্ঘ হ্রস্ব,　　নাহি শীত নাহি গ্রীষ্ম,
শীতল সর্ব্বত্র জলস্থল।
কুমুদ কহ্লার কমলে,　　জ্যোৎসনায় জলে উজলে,
নক্ষত্রে সাজান নভতল॥
জলাশয়ের দুই পারে থাকি,　　চক্রবাক্ আর চক্রবাকী,
সুখে করে ধ্বনি প্রতিধ্বনি।
চকোরে চায় চাঁদের পানে,　　মধুপে ধায় মধুপানে,
সুখময়ী দম্পতি-যামিনী॥

নিরখি উপযুক্ত সময়, ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মতনয়,
ব্রহ্মানন্দে হয়ে নিমগন।
আনিতে ব্রহ্মময়ী ধরায়, প্রণব ঝঙ্কারি বীণায়,
হিমালয়ে করিলেন গমন॥
যতই পথে অগ্রসর, প্রণবে ততই উচ্চ স্বর,
সরে নয়নে আনন্দাশ্রু ধারা।
ওম্ ছাড়িয়া উমা বলেন, উমা ছাড়িয়া মা মা বলেন,
শেষে, "জয় মা" বলি হলেন আত্মহারা॥
মাতৃভাবের কি মাধুর্য্য, কি মধুর সে ভাবচাতুর্য্য,
বুঝিতে বর্ণিতে সাধ্য কার।
তাইত হতে মায়ের সন্তান, বাঞ্ছা করেন শ্রীভগবান
সইতে নিত্য স্নেহের তিরস্কার॥
বাৎসল্যে যে ভজে হরি, তাহার তুল্য নাহি হেরি,
হরির উপর প্রভুত্ব সে করে।
এতই পায় সে অধিকার, হরি হন অনুগত তার,
তাহার আজ্ঞা বহেন ধরি শিরে॥
মা হলে তার কি প্রভুত্ব পুত্রের বা কি আনুগত্য,
তাহার সাক্ষী বৃন্দাবনে পাই।
বিরাট বিশ্বেশ্বর হরি, ব্রহ্মার দর্প চূর্ণ করি,
যশোদার ভয়ে কম্পিত সদাই॥
যশোদার কোলে হলেন ছেলে, মেয়ে হলেন মেনকার কোলে
সর্ব্বস্থলে আত্মগোপন তাঁর।
ব্রহ্মাণ্ড যার অঙ্গে ঝুলে, জননী তাঁয় করেন কোলে,
বলিহারি বাৎসল্য-লীলার॥
বলিহারি বাৎসল্য-রসে, শৈল সিক্ত হয় যার বশে,
পাষাণ কাঁদে উমা উমা বলে।

বাৎসল্য সুধারসের খনি   সর্ব্ব রসের শিরোমণি,
ভাবি ঋষি ভাসেন নয়নজলে ॥

খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

এমন মধুর মা-নাম মন্ত্রে রসনা কেন রসনারে।
(আর) মনরে কেন ভাবনারে শশী অভয়া বরণারে ॥
কেন রে মন নিশি দিব,   পরিহরি পরম শিব,
অশিবকর ষড়রিপু   সেবা বাসনারে,—
পরিহরি পরকরম   পরধরম লাভে চল,
তুলি অপরাজিতা জবা জলকমল বিল্বদল,
ঐ জননী পদকমল কর আরাধনা রে ॥
নয়ন আন দরশন-বাসনা অপনয়ন কর,
শয়নে জাগরণে পরমধ্যানে ত্রিনয়নায় হের,
আর, পূজোপচার অন্বেষণে চরণ চলনারে ॥
ভুলুয়া ভাবে এই ভবে হেন সুদিন পাব কি হায়,
পূজিব মন প্রাণ ভরি (ঐ) হরিহর-পূজিত পায়,
আর 'জয়মা' বলি দিব বলি মা ছাড়া আন বাসনারে ॥

ভক্তির মূর্ত্তি নারদ ঋষি   হিমালয়ের ভবনে পশি
মেনকাকে করিলেন দর্শন।
দর্শি নারদ মেনকায়,   অতি হর্ষে মত্ত প্রায়,
প্রেমানন্দে ঝরে দুনয়ন।
হেরি তার সজল নয়ন,   মেনকা রাণীর মন উচাটন,
মনে ভাবে উমার অমঙ্গল।

নারদের কর ধরি বলে, নয়ন পূর্ণ কেন জলে,
অগ্রে কহ কৈলাসের কুশল।
কেমন আছে উমা আমার, কেমন আছে উমার কুমার
কেমন আছেন জামাই মৃত্যুঞ্জয় ?
—মৃত্যুঞ্জয়ে কন্যা দিয়ে, শান্তি নাই মোর খেয়ে শুয়ে
কখন কি হয় সদাই মনে ভয়।
একেত অতি বৃদ্ধকাল, অনিশ্চিত কালাকাল,
তাহে মত্ত হলাহল পানে।
কালিকার বালিকা উমা, সংসারের কিছুই জানে না,
তার কপালে কি আছে কে জানে !
জামাই ভাল মন্দ হলে, থাকবে কি আর সে ভূতলে
পতির সঙ্গে সতীর অবসান।
উমাশূন্যা হলে ধরা, মুহূর্ত্তে হব জীবন-মরা,
পাষাণ ফাটি হব শতখান।
বল নারদ অগ্রে বল, কৈলাসের ত সুমঙ্গল,
উমা আমার আছে ত মঙ্গলে ?
মঙ্গলে ত আছে কুমার, মঙ্গল ত সিদ্ধি দাতার ?
মঙ্গলে ত আছে আর সকলে !
লক্ষ্মী সরস্বতী দুজন, এক ঘরে ত থাকে এখন ?
কলহ ত করে না বোনে বোনে ?
হলে সরস্বতীর ছেলে, লক্ষ্মী ত তায় করে কোলে ?
—আমার দুঃখ তাদের কথা শুনে।
একই মায়ের দুটী মেয়ে, দুজন চলে দুপথ দিয়ে,
কারো ছেলে মাসীর সোহাগ পায়না।
বড় ভগ্নীর পুত্র বলি, লক্ষ্মী স্নেহ করেনা ভুলি,
—স্নেহ দূরে,—ম'লেও ফিরে চায় না।

মেয়ে আমার নয়গো মন্দ, জামা'র দোষে এ সব দ্বন্দ্ব,
—কেমন আছেন জামাই মহেশ্বর ?
ছেড়েছেন কি সিদ্ধির নেশা, ভূতের সঙ্গে ভালবাসা ?
সাপের বাসা নাই ত শিরোপর ?
ছেড়েছেন কি গরল খাওয়া, শ্মশানঘাটে আসা যাওয়া,
ছেড়েছেন কি ভস্ম মাখা গায় ?
করেছেন কি বাসস্থান, অন্ন বস্ত্রের সংস্থান ?
—বাঘের চামড়া নাই ত আর মাজায় ?"

শুনি দেবর্ষি ধীরে বলেন, তেমনি আছেন যেমন ছিলেন,
পরিবর্ত্তন কিছুই ঘটে নাই।
এখনো ভূতের নাথই তিনি, সর্ব্বত্র শ্মশানের স্বামী,
এখনো অঙ্গে যত্নে মাখেন ছাই।
এখনো অনল জ্বলে ভালে, অনঙ্গ যায় প্রাণ হারালে,
বসন বিনা এখনো দিগম্বর।
এখনো ত্রিবিধ তাপের গরল, পরিপাকে তাঁর রুচি কেবল,
এখনো কালময় তাঁর কলেবর।
দেব দানব যে কেহ তাঁরে, ডাকিলেই যান তাহার ঘরে,
এখনো তাঁহার নাই জাতি-বিচার।
ত্রিলোকে এমন স্থানই নাই, যেখানে না শুনিতে পাই,
তাঁহার আলোচনা অনিবার।
কিছু মানুষের মত হলে, দুকথা তায় বুঝান চলে,
একেবারে অমানুষ যে হয় ;
বলা না বলা তাহায় সমান, ভূতের কাণে মন্ত্র প্রদান,
অঙ্গার ধুলে সাদা হওয়ার নয়।
অচেতন যে সিদ্ধিপানে, ভালমন্দ সে কি মানে ?
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি তাহার ঠাঁই।

নাই তার ক্ষুধা নাই তার তৃষ্ণা, নাই আসক্তি নাই বিতৃষ্ণা,
দারাপুত্রের ভাবনা তাঁহার নাই।
তুমি ত তায় ভেবে মর, তিনি সমস্ত ভাব্নাহর,
কালের ভাবনা তাঁহার নামে লীন।
নাই তার শীত নাই তার গ্রীষ্ম, নাই তার দীর্ঘ নাই তার হ্রস্ব,
নাই তাঁর রাত্রি, নাই গো তাঁহার দিন।

খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

তোমার এমন জামাই কেমন, তাহা কি কহিব তোমায়?
ভালমন্দের অতীত যে জন, তার ভাল কি সুধাও আমায়?
এ সংসারে যারা মানী, যাদের শ্রেষ্ঠ বলি মানি,
তারা কেহই গুণ রাণি, তাঁর কাছে না যায়,—
যত দীন হীন কাঙ্গাল দুখী তাপী অভাজন,
দেখি তারাই তাঁহার পাছে পাছে ঘুরে অনুক্ষণ।
আবার যত গৃহত্যাগী তাঁর নামে সভা মিলায়॥
চতুষ্পাদ বৃষ বাহন, বৃষ তাঁহার সর্ব্বস্ব ধন,
যেমন সঙ্গে থাকে তেমন, বুদ্ধি লোকে পায়——
চতুষ্পাদ চরণতলে দলন করি গমন যাঁর,
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ তাঁয় ডাকি বুঝান ভার।
তাঁর অসাধ্য কর্ম্ম কিছু দেখি না আর এ ধরায়॥
অমরে করে অমৃত পান, তিনি গরলে অমৃত পান,
তাঁহার যত উল্টো বিধান বল্‌ব কি তোমায়,——
অতি বৃদ্ধ তবু নাহি মৃত্যুভয় একবিন্দু তাঁর,
যত ভূতের ঘরে ঘরে, ঘোরা ফেরা অনিবার।
ভুলুয়া গায় ভূতের ঠাকুর ভূতের ঘরে ভূত নাচায়॥

তার পরে তনয়া দুটী,　　দুটীরই সন্তান কোটী কোটী,
তারাও উমার সংসারেই থাকে।
উমাই তাদের পালন করে, বাঁচে তারা উমারই জোরে,
বিপদ হ'লে উমাই তাদের রাখে।
তনয়া দুটী তেমন নয়,　　ফাকে ফাকে সর্ব্বদাই রয়,
কারো প্রতি নাই গো কারো টান।
এমনি ভাবে রয় দুজনা,　　দেখে বুঝ্‌তে কেউ পারেনা,
তারা যে দুজন এক মায়ের সন্তান।
সরস্বতীর তনয় হ'লে,　　লক্ষ্মী তায় করে না কোলে,
মাসী বলি কেউ আসে যদি কাছে,
সর্ সর্ তায় লক্ষ্মী বলে,　　মলিন মুখে যায় সে চলে,
—তারা লক্ষ্মীছাড়া হয়েই আছে।
সাদাসিদে সরস্বতী,　　লক্ষ্মী রূপৈশ্বর্য্যবতী,
লক্ষ্মীর জ্যেষ্ঠ পুত্র অহঙ্কার,
মাসতু' ভাই আছে যারা,　　দাদা বলি ডাক্‌লে তারা,
দেয় না উত্তর ভুলেও একটীবার।
উমার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার,　তার অবস্থা বল্‌ব কি আর,
আজ পর্য্যন্ত হয় নাই তার বিবাহ,
এত সস্তা মেয়ের বাজার,　　সেটা থাক্‌ল চিরকুমার,
শিবের বংশ রক্ষাই ত সন্দেহ।
তারপরে গণেশের কথা,　　সেটা এখন সিদ্ধিদাতা,
উন্নতি যা হওয়ার তার হয়েছে।
সিদ্ধির আশায় মত্ত যারা,　　তার পাছে সর্ব্বদা তারা!
—সিদ্ধির ঘরের কর্ত্তা সে হয়েছে!"
শুনিয়া নারদের বাণী,　　ঘোর বিষাদে গিরিরাণী,
ছাড়িয়া এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস,

বলেন "যা কহিলে তুমি, সবই সত্য মানি আমি,
—তোমার কথায় নাহি অবিশ্বাস।"
নারদ বলেন, "শুন রাণী স্বচক্ষে দেখে এলাম আমি,
অন্নের কষ্ট অন্নপূর্ণার ঘরে,
রাজরাজেশ্বর বিশ্বনাথ, না আছে কাপড় না আছে ভাত,
সন্তান যত সবাই লেংঠী পরে।

জয় জয়ন্তী—একতালা।

রাণী তোমায় কি বলিব আর ?
—তোমার কোলে যে সুখ ছিল,
সে সুখ এখন নাই উমার ॥
সেদিন আমি দিব্যচক্ষে করিয়াছি দরশন,
কণক-বরণা উমা হয়েছে কালী এখন,
এক তিল না সহে ব্যাজ, চারি হাতে করিছে কাজ,
তবু কাজ ফুরায় না—ভূতের এমনি সংসার ॥
তোমার কন্যাটী করুণাময়ী জামাইটী মরণাবাস,
প্রজাপতির কি নির্ব্বন্ধ হাসের ঘরে মহাত্রাস।
এ অপূর্ব্ব মিলন স্মরি, হাসি কান্নার জগৎ ধরি,
শিবশক্তিময় এ জগৎ ধারণা সবার।
মন্দিরে মন্দিরে থাকেন নাহি তাঁদের বাসস্থান,
নিবেদিত নৈবেদ্য বিনা অন্নেরও নাই সংস্থান।
কারো অঙ্গে নাহি বসন, সর্ব্বদা স্বরূপে ভ্রমণ,
ভুলুয়াও কয় এই ত রাণি স্বরূপ সমাচার ॥

শুনিয়া সমস্ত কথা,　　গিরিমহিষীর মর্ম্মে ব্যথা,
দুনয়নে বহে বারিধার।
অঞ্চলে নয়ন মুছে,　　মুছে আর নারদে পুছে,
কহ নারদ উপায় কি আমার॥
অদৃষ্টে যার থাকে যাহা,　　খণ্ডন অসাধ্য তাহা,
নইলে উমা রাজার নন্দিনী।
প্রজাপতির কি নিৰ্ব্বন্ধ,　　নাই যাহার ঐশ্বর্য্যের গন্ধ,
হইল সেই ভিখারী-গৃহিণী।
যদি কেবল ভিখারী হত,　　তাতেও মনে দুখ না র'ত,
ধনরত্নের অভাব কি আমার?
ঘর-জামাই করিয়া হরে,　　রাখতাম নিত্য সমাদরে,
ভিক্ষা করতে নাহি দিতাম আর॥
একমাত্র উমা আমার,　　সম্পত্তি যা সকলি তার,
আমরা ত আছি দুদিন মাত্র।
এখন আসি বুঝি নিলে　　সুবিধা হত পরকালে,
কিন্তু শিব ত নহেন কথার পাত্র।
ভূতের দৃষ্টি যাহার ঘাড়ে,　স্বভাবে তাহার লক্ষ্মী ছাড়ে
সে কি শুনে সতের উপদেশ।
— তুমিই ত যত নষ্টের গোড়া, জুঠে একটা কপালপোড়া
ঘটিয়ে দিলে অশান্তির একশেষ।
যাহোক যদি আবার যাও,　বলিও আমার মাথা খাও,
বুঝাইয়ে তাঁহাকে আমার কথা,
যা আছে সৰ্ব্বস্ব তাঁর,　　এইখানে এখন আর,
আসিতে যেন না করেন অন্যথা।
মেনকার বাৎসল্য দেখি,　　জলপূর্ণ নারদের আঁখি,
বলেন, "বাৎসল্য-ভাবের বলিহারি।

বিরাট বিশ্বের বিশ্বেশ্বরে, নিঃস্ব তুয্য মনে করে,
মঙ্গল চায় তাঁর যিনি মঙ্গলকারী।
ব্রহ্মাদি অমরে যাঁরে, জননী বলে অর্চ্চে, তাঁরে
দুখিনী বলি অন্তরে সদা চিন্তে।
উদরে ধরি পালন করি, চিন্‌তে নারে বিশ্বেশ্বরী,
চিন্‌বে কে, সে নাহি দিলে চিন্‌তে॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

চিন্‌তে তাঁরে ভবে সাধ্য কার?
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত প্রকাশ যাঁর॥
আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত, নাহি যাহার রূপের অন্ত,
যাঁহার রূপে রূপবন্ত অনন্ত জগদাধার॥
ঘরে ঘরে নৃত্য করি, বেড়ায় দিবা বিভাবরী,
ঘরের মানুষ ঘরে বসি, ক'জন রাখে খবর তার॥
ভাবিয়া ভুলুয়া বলে, ইচ্ছায় সে না ধরা দিলে,
অঙ্কে পেলেও বিদ্যা বুদ্ধি কৌশলে তাঁয় ধরা ভার॥

নারদ বলেন শুন রাণি! তুমি যা বল বুঝি আমি,
তোমারও যখন উমা ছাড়া নাই।
কৈলাসে যখন কেবল কষ্ট, আর না করি সময় নষ্ট,
হরের উচিত থাকা ঘর-জামাই॥
আবার সে কৈলাসে গেলে, বিশ্বনাথের দেখা পেলে,
বুঝাইয়ে বলব সকল কথা।
তাঁর মত পোড়াকপালে, ঘটবে না আর কোনও কালে,
কোনও দেশে এমন কুটুম্বিতা।

এমন সুযোগ যদি যায়, আর ঘটাই ত হবে দায়,
—সবাই করে ভবিষ্যতের আশা,
ত্যাগ করি শ্মশানের বাসা, ভূতের সঙ্গ সিদ্ধির নেশা,
উচিত হরের এখানে এখন আসা।
হয়েছে যখন দুটো ছেলে, দুটো মেয়ে উমার কোলে;
তাদেরও ত উপায় একটা চাই।
এখন ত এক ভিক্ষাবৃত্তি, ইহার পরে যা সম্পত্তি,
তাতে কেবল বৃষ একটা পাই॥
মৃত্যুঞ্জয়ের মরণ হলে, পালনের লোক নাই ভূতলে,
তারা মামাবাড়ীই থাক্‌বে চিরকাল,
গিরিরাজকে পাঠিয়ে দিয়ে, নিয়ে এস সব হিমালয়ে,
কাজ কি রেখে কৈলাসে জঞ্জাল।
শুনিয়া নারদের বাণী, গিরিকে কহে গিরিরাণী,
"নারদ আসিয়াছে খবর নিয়ে,
উমার দুখের অন্ত নাই, ভূত নাচিয়ে বেড়ান জামাই,
অজ্ঞান হয়ে থাকেন সিদ্ধি খেয়ে॥
গণেশকে করেছেন সিদ্ধিদাতা, —তা আর কি আশ্চর্য্য কথা!
যেমন বাপ তার বেটাও হয় তেমন,
সেটা হয়েছে সিদ্ধালয়, নাই তাতে কোন সংশয়,
—ছেলেটা দিয়ে সিদ্ধি বিতরণ॥
পতিপুত্রে সিদ্ধির নেশা, ঘরে বাহিরে ভূতের বাসা,
উমার আশা দিয়াছি ছাড়িয়ে;
হয়ে উদ্যোগী যত্নপর, উমা আনিতে যাত্রা কর,
তিলার্দ্ধ না বিলম্ব করিয়ে।

রামকেলী—ঠেকা।

এমন বরে, কে দান করে,
আপন করে, আপন কন্যে।
যার, বৃষ বাহন, ভস্ম ভূষণ,
হৃস্ব ভূতে অগ্রগণ্যে।
তুমি, নও দরিদ্র, নও অভদ্র,
আসমুদ্র লোকে মান্যে।
তবু, কি অদ্ভুত ...... ধরি ভূত,
করলে দান অসামান্যে॥
উমার চিন্তায়, প্রাণান্ত প্রায়,
থাকি সদাই শূন্যে শূন্যে।
ভুলুয়াও কয়, সর্ব্বদাই ভয়,
মৃত্যুঞ্জয়ের মরণ জন্যে॥

বিভাস—একতালা।

ঐ শুন গিরি, উমার কত দুখ,
নারদ আসিয়া বলিছে।
নারদের নিকটে, আমার উমা কত,
মা, মা, বলি কেঁদেছে॥
এমন বিবেচনা কোথাও দেখি নাই,
দেখে শুনে আন্‌লে ভাঙ্গড় জামাই,
ছিল যা উমার, রত্ন অলঙ্কার,
সব বেচে ভাঙ্গ খেয়েছে॥
নির্ম্মম ত্রিশূলীর নাহি কাণ্ডজ্ঞান,
জগত উৎসাদনে নিত্য সে প্রধান,

এমন মহাকালে কন্যা সম্প্রদান,
তুমি ছাড়া আর কে·করেছে ॥
স্বর্গ ছাড়ি শ্মশানক্ষেত্রে যাহার বাসা,
দেবতা ছাড়ি ভূতের সঙ্গে ভালবাসা,
মাথায় সাপের বাসা, অষ্ট প্রহর নেশা,
মোরা ছাড়া এমন জামাই কার আছে ॥
দেবতার কুচক্রে তুমি ত পাষাণ,
তাই উমার কপালে এ সব বিধান,
নাহি বাসস্থান, অন্নের সংস্থান,
অষ্ট প্রহর জ্বালায় জ্বলিছে ॥
এমন কপাল করি এবার এসেছিল,
দুখে দুখে আমার বাছার জীবন গেল,
উমার দুখে দুখী হয় এমন না দেখি,
কেবল এক ভুলুয়া যা কিছু হয়েছে ॥

তখন, নারদে করি দরশন, গিরিরাজ আনন্দে মগন,
ভক্তি ভিন্ন মা নন বশীভূতা।
এসেছেন ভক্তি মূর্ত্তি ধরি, এখনে যদি যত্ন করি,
সুপ্রসন্না হবেন জগন্মাতা।
নারদে তখন সঙ্গে করি, কৈলাসে চলিলেন গিরি,
অনন্ত অনুরাগ ভরে, আনিতে প্রাণ উমা।
সদাশিবের ভবনে আসি, আবেগে দিল ধৈর্য্য নাশি,
স্তুতি মিনতি করিলেন কত নাহি তাহার সীমা ॥
রজত-গিরি বক্ষে যদি, বহয়ে নীল-কালিন্দী-নদী,
সেই নদীতে ফুটে যদি কনক-কমলিনী ;

তাহাতে যে সুদৃশ্য হয়, তাহাও তুলনার যোগ্য নয়,
হরের কোলে গৌরী-শোভা দেখিলেন এমনি ॥
আশুতোষের আদেশ নিয়ে আশু-যাত্রা বিরচিয়ে,
আশু-বরদায় সঙ্গে করি, আসিলেন হিমালয়।
জগজ্জননীর যাত্রা সঙ্গে ত্রিজগত সাজিল রঙ্গে,
সুরাসুর কিন্নর নর, কেহ না বাকী রয় ॥

সুরট মল্লার—পোস্ত।

চলিলেন মা হেমবরণা হিমাচলনাথ ভবনে।
গজাননে লয়ে কোলে, গজপতি-বৈরী বাহনে ॥
ব্রহ্মাদি বালক যারা, মায়ের সঙ্গে চলে তারা,
চলে সুর অসুর নর, কিন্নরগণে,—
রবি, শশী, গ্রহ, তারা, তারাও মায়ের সঙ্গে চলে,
আর, নীরব নিঃস্বনে, সবাই মা মা বলে প্রণব ছলে।
চলে আকাশ, চলে বাতাস, হিমালয়ে আজ মহা প্রকাশ,
দুর্ভাগা ভুলুয়া একা দূরে রহে দুর্ম্মতি সনে ॥

সুরট মল্লার—পোস্ত।

নিরুপমা আনন্দরূপা উমায় গিরি আনি ঘরে।
ধৈরজ ধরিতে নারে সুবিপুল আনন্দভরে ॥
উমার রূপে নয়ন দিয়ে, উমার কুমার কোলে নিয়ে,
কহে এমন শীতলতা নাই শশধরে,—
নয়নে বহে পুলকধারা, জিনি ভাদর-বারি-ধার,
করণীয় কি বুঝিতে নারি রাণীকে ডাকে বার বার।

এস রাণি, নিরখ রাণি, ভবনে আমার ভবরাণী,
ভুলুয়া ভণে পাদুখানি, তরণী ভব-পারাবারে ॥

বিভাস—একতালা।

গা তোল রাণি, মোদের নয়নমণি,
হরমনোরমা ঐ এসেছে।
সে, তোমা না দেখিয়ে, দুয়ারে দাঁড়ায়ে,
মা মা বলি ঐ ডাকিছে ॥
উঠ, গা তোল নিরখ উমারে,
কোলে কর আমার প্রাণ কুমারে।
যাহা থাকে ঘরে, খেতে দেও বাছারে,
অনাহারে অনেকক্ষণ রয়েছে ॥
নিকটে নয়—বহু দূরের পথ কৈলাস,
পথশ্রমে আমার উমার নাই অভ্যাস,
তাহে মৃগেন্দ্র বাহন, কত গিরি বন,
যেন অতিক্রম করি মা এনেছে ॥
তুমি ত বলিতে উমার কিছু নাই,
ভিখারিণী উমা পাগল জামাই,
প্রাণের উমা দুখে রয়েছে,—
উঠ, গা তোল, নিরখ আসিয়ে,
লক্ষ্মীনারায়ণ উমার জামাই মেয়ে।
রাজরাজেশ্বরী মোর উমাসুন্দরী,
এমন মেয়ে ভবে, আর কার আছে ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র বায়ু বরুণ যত,
আমার উমার সঙ্গে সবাই সমাগত।

শিবের দলবল, এসেছে সকল,
ভুলুয়াও সঙ্গে ঐ রয়েছে ॥

শুনিয়া রাণী নয়নধারা অঞ্চলে মুছিয়া রে।
উন্মাদিনী সমানা ধায় উধাও হইয়া রে।
সম্বরিতে নারে বসন, বাঁধিতে নারে কেশ রে।
পড়ে কি মরে, চলিতে নারে, আলুথালু বেশ রে ॥
চেতনাহীন মানব যেন নবজীবন পাইয়া রে।
আনন্দে আপনাহারা উমা উমা বলিয়া রে ॥

বিভাস—গড়খেমটা।

বলে, কৈ কৈ প্রাণ উমা, প্রাণের প্রিয়তমা,
অনুপমা আমার হরমনোরমা।
আয় কোলে মা বলে, আয় মা করি কোলে,
জুড়াই মা তাপিত মনবেদনা ॥
দু চার দিন নয় বাছা একটী বৎসর,
তোমার অদর্শনে হতেছি জর্জ্জর।
(তোমায়) দিয়ে হরের ঘরে, যে দুঃখে দিন যায়,
মর্ম্মী বই তাহা কেউ বোঝে না ॥
জন্মেছিলে বাছা হয়ে রাজ-নন্দিনী,
বিধির চক্রে হ'লে ভিখারী-গৃহিণী,
ছিল অট্টালিকায় স্থান, এখনে শ্মশান,
মার প্রাণে এত কভু কি সয় মা ॥
কি করিব, আমার কিসের অভাব আছে,
কিন্তু মা কিরূপে পাঠাই তোমার কাছে?

একে ভূতের ভয়, তাতে সবাই কয়,
হরের করে কারো মান থাকে না ॥
মানী কি অমানী, ধনী কি নির্ধন,
মূর্খ কি পণ্ডিত, সাধু কি দুর্জ্জন,
একই শ্মশানে সবায় দেন বিছানা,—
নারদও আসিয়ে সে দিন বলি গেছে,
উচ্চ নীচ নাই সদাশিবের কাছে,
এমন হলে যারা, মানী মানুষ—তারা
শিবলোকে যেতে কেউ চাহে না ॥
ধনমানে যারা অন্বিত সংসারে,
প্রাণ গেলেও তারা মান নাহি ছাড়ে।
যারা চায়না মান, তারা ভক্তিমান,
তারা, ধনরত্নের বোঝা কেউ বহে না ॥
ধনরত্নের বোঝাবাহী যত জীব,
বুঝালেও তারা কেউ মানে না শিব।
তারা, বলে এই ভূলোক, মোদের শিবলোক,
তোমার শিবলোকে যাওয়ার লোক মিলে না ॥
সে দিন আসি নারদ বলে শতমুখে,
হয়েছে মা কালী হরের ঘরে দুখে।
নাহি বাসস্থান, অন্নের সংস্থান,
বসন বিনা থাকে দিক্‌বসনা ॥
তোমার দুখে বসি কান্দি মা যখন,
পাষাণ বলি কেবল ঘটে না মরণ।
ঘটে মরণের অধিক যাতনা,—
রোধ কর্ত্তি দৃষ্টি বহে অশ্রুধার,
দশদিকে কেবল দেখি অন্ধকার।

আমার, অসময়ের বন্ধু, ভুলুয়া তোমার,
আসিয়ে তখন করে মা সান্ত্বনা ॥

এত কহি মেনকারাণী, কোলে নিয়ে দীনতারিণী,
দীন-নয়নে নিরখে চান্দ মুখ।
ঘন ঝরে নয়নে জল, উমার অঙ্গে পড়ে সকল,
সহিতে নারে হৃদয়ভরা দুখ ॥
কণ্ঠ রোধে কহিতে কথা, নিরখি মার মনের ব্যথা,
—বিষের ব্যথা যাহার নামে ক্ষয়।
ধীর বচনে মাকে বলে, ভাসিস্ না আর নয়নজলে,
শুনিস্ যা তা সকল সত্য নয় ॥

শুনিস্ যা তা সকল সত্য নয়।
নানা কথায় নারদ তোকে, পরিহাসে সব সময় ॥
লোকে লক্ষ্মীমন্ত হয় লভি যে লক্ষ্মীর দয়া,
জানিস না কি,জননী সেই লক্ষ্মী মোরই তনয়া!
মণিময় বেদীর উপরে, লক্ষ্মী আমায় পূজা করে,
যত্নে রাখে মণিপুরে, আসন অনাহত মণিময় ॥
কে তোকে বলেছে নাই মোর অন্নবস্ত্রের সংস্থান,
যে বলে সে বলুক সে ত জানে না ঘরের সন্ধান!
গৌরবের বাস দিগম্বরী, সে বসন ত আমিই পরি,
আবার বিশ্বের অন্ন দান করি, তাই, লোকে অন্নপূর্ণা কয়
চন্দ্র সূর্য্য-তারা-মণি খচিত মা আমার বাস,
আমারই বাসের আভাসে, এই বিপুল বিশ্বের পরকাশ।
গ্রহ উপগ্রহ যত, আমারই অঞ্চলাশ্রিত,
শুনিস্ নাই কি সৌরজগৎ, দিক্‌বসনের সূত্রে রয় ॥

বিশ্বজীবে পরিপূর্ণ আমার বৃহৎ গৃহস্থলী,
তাই আমাকে বিশ্বজীবে ডাকে জগদ্ধাত্রী বলি।
চারি হাতে খাটিতে হয় মা, অফুরন্ত কাজ ফুরায় না।
হাত তুলিয়ে দিতে হয় মা, অষ্ট প্রহর বরাভয়॥
কে তোকে বলেছে শম্ভু কেবলই শ্মশানে রন,
সহস্রদল-সিংহাসনে রহে তবে কার আসন?
আজ্ঞাচক্রে কেবা আসি, আজ্ঞা করেন দিবানিশি,
কাহার আজ্ঞা অনুসারে এ বিরাট ব্রহ্মাণ্ড রয়॥
শিবলোকের অন্তর্গত এ অনন্ত বিশ্বলোক,
ইহা, শবলোক মুহূর্ত্তে হয় মা, যদি হারায় শিবালোক।
শিব শিব বলে যারা, শ্মশানের ভয় পায় কি তারা,
সদানন্দে ভ্রমে তারা প্রত্যহই ত শিবালয়॥
কার কাছে শুনেছিস্ নাই মা আমার অঙ্গে অলঙ্কার?
অলঙ্কার অক্ষয় অমূল্য আমার মত আছে কার।
বারত্বের মূরতি কুমার, সিদ্ধিদাতা গণেশ আমার,
লক্ষ্মী সরস্বতী সবাই আমার অঙ্গ উজলয়॥
সত্যবাদী সচ্চরিত্র সদাশূন্য অহঙ্কার,
পুত্র যত তারাই ত মা আমার অঙ্গের অলঙ্কার।
জিনি চন্দ্রসূর্য্যের প্রভা, সে সব অলঙ্কারের শোভা।
তারা উজলে মা এই ধরাতল কে না জানে পরিচয়॥
দীনের বেশে বেড়ায়, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী ভক্তিমান,
তাদেরই ত হৃদমন্দিরে লক্ষ্মীকান্তের বাসস্থান।
দেবত্বের সম্পত্তি যত, তাদের ঘরে লুক্কায়িত,
তাহাদের জননী হলে, তায় কে ভিখারিণী কয়॥
পঞ্চকোশী-বারাণসি পাতা আমার সিংহাসন,
যে যায় কাশী দেখি আসি বিশ্বাসী হয় সেই জন।

মুক্তি-রত্ন-নিকেতনে, শ্মশান বলে ভ্রান্ত জনে,
অনন্ত শান্তি-নিকেতন, ভবন আমার শ্মশান নয় ॥
স্বরূপে সচ্চিদানন্দ আনন্দে দেখেন স্বরূপ,
অলঙ্কার পরিলে বলেন স্বরূপে হল বিরূপ।
তাই স্বরূপ-তত্ত্ব তরে, রাখেন সদা বক্ষোপরে,
আবার স্বরূপ-জ্ঞানে বসে যারা, স্বরূপ অর্চ্চে সমুদয় ॥
কেন মুখে দুর্ভাগিনী বলিস আমায় বার বার,
ভেবে দেখ মা ভাগ্যবতী আমার মত কে-বা আর।
কে তত্ত্ব বুঝাবে তোকে, তার কি কভু দুঃখ থাকে,
তোর ভুলুয়ার মত শত পুত্র যে মার অঙ্কে রয় ॥
রাণী বলে, "ভাগ্যবতী এতই যদি তুমি হও।
এই আশীর্ব্বাদ করি, তুমি কোটী কল্প বেঁচে রও।
পতি-পুত্র নিয়ে তুমি কর মা সুখের সংসার।
তোমায় সুখে দেখি যেন আমার অন্ত হয় এবার।
সুখে থাক সদানন্দের সুখের গৃহে অনিবার।
(তবে) দুখিনী মায় ভুলিও না, দেখা দিও এক এক বার ॥
যতক্ষণ নিকটে থাক, রয়না মনে কোন গোল।
নিকট ছাড়া হলেই মনে আসে যত অমঙ্গল।
কোথায় আছ, কি করিছ, কেমন আছেন মহেশ্বর,
কি ভাবে দিন যাচ্ছে তোমার, ভাবি কেবল নিরন্তর।
যে যা বলে তাই শুনি মা, বুঝ্‌তে নাহি পারি তার,
কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা, তাই কান্দি মা অনিবার।
তোমার, মুখ দেখিলে দুখ থাকেনা, দুখহারিণী তুমি আমার।
তুমি, এক পল নিকট ছাড়া হলে, দেখি জগৎ অন্ধকার।
মণ্ডপে প্রতিমা গড়ি নিরখি মুখ অনিবার।
নিরখিলে কি হবে, তায় হয় না শান্তি পিপাসার।

অন্নপূর্ণা হও মা তুমি,　　জগন্নাথ হউন জামাই।
ভাগ্যবতী হলে কি আর মার কাছে আসিতে নাই।
এমন করি ভুলে কি মা,　　থাকিতে হয় এতদিন।
উমা—উমা বলি আমি কেন্দে বেড়াই নিশিদিন ॥

থাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

কেমন করি এমন ভাবে,　　এতদিন মা ছিলে ভুলে।
আমি দিবানিশি কেন্দে ফিরি কৈ উমা, কৈ উমা বলে ॥
মার প্রাণ সন্তানের তরে,　　দিবানিশি যেমন করে,
সন্তানের মা হয়েও কি মা,　　বুঝতে নারিলে,—
হেরিতে তোর এ চান্দ বদন　　কত শারদ-গগন-চান্দ
সারানিশি নিরখি বসি—জুড়ায় না তায় তাপিত প্রাণ।
পীযূষের পিপাসা শান্ত হয় কি মা ঘোলে ॥
নিশিতে ঘুমায়ে থাকি,　　স্বপ্নে যেন তোরে দেখি,
আয় উমা আয় বলি ডাকি,　　নিতে যাই কোলে,—
হাত বাড়িয়ে পাইনা তোমায়, ভেঙ্গে যায় সুখের স্বপন,
বুক জ্বলে জ্বলন্তানলে,　　জলে ভাসে দুনয়ন।
তখন তোর ভুলুয়া আসি, বুঝায় মধুর বোলে ॥

তখন, রমণীকুল-শিরোমণি,　　মহেশ্বর মনমোহিনী,
সান্ত্বনা করিতে জননীরে,
কত হাসে মধুর হাস,　　কহে কত মধুর ভাষ,
অঞ্চলে মুছায় নয়ননীরে।
বলে, "মেয়ে এলে বাপের ঘরে,　আনন্দে সে পাড়া ভরে,
আমি পাড়া দিলে মা তোর ঘরে।
অশ্রুধারায় বহে গঙ্গা,　　পাড়ার লোকে হারায় সংজ্ঞা,
আর্ত্তনাদে আকাশ পাতাল ভরে।

আসি না বলি কেবল কাঁদিস্, আসার সময় কৈ তুই দেখিস্,
বিশ্বজোড়া গৃহস্থলী যার,
তার কি আছে কাজের অন্ত, আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত,
কোথায় কি হয় চিন্তা সদা তার।

বিভাস—ঝাঁপতাল।

ভুলি নাই মা, কান্দিস্ না মা, আমার মনে থাকে সকল।
তবে কেমন করি এমন ভাবে নিতি নিতি যাই আসি বল॥
বিধাতার নির্ব্বন্ধে এবার, চরাচর তোর উমার কুমার,
কে কোথায় কি ভাবে থাকে, ঐ ভাবনা ভাবি কেবল॥
মায়ের প্রাণ সন্তানের তরে, যা করে তা কেউ না ধরে,
(আবার) আমার মা, আমার মা বলি দেবাসুরে বাধায় কোন্দল॥
(দেবে বলে আমার মা, দানবে বলে আমার মা)॥
তুই কান্দিস্ এক উমা বলে, তোর উমা কান্দে ব্রহ্মাণ্ড বলে,
এক নিমিষও থামে না মা, তোর উমার দুই নয়নের জল॥
সে দেশে নাই বিদ্যা পড়া, ছেলে গুলো প্রায় বেয়াড়া,
(অবিদ্যার খেলা যত মা)
পালনে মোর প্রাণান্ত হয়, তারপরে তোর জামাই পাগল॥
তুই বলিস্ ভুলুয়া ভাল—সে আমার আর এক জঞ্জাল,
সে দিবানিশি থাক্‌বে কোলে, আর বসি মা কাঁদবে কেবল॥

আমি যেমন কেবল তোর একটী, আমার তেমন কোটী কোটী,
কোটী কোটী প্রকৃতির বশ তারা।
সাধ্য নাই শাসনে রাখি, অসহ্য হলে থাকি থাকি,
মা তোর জামাই করেন মারা ধরা॥
মায়ার কঠিন রজ্জু দিয়ে, ফেলে রাখি সব বান্ধিয়ে,
বাঁধন ছিড়ে দু একটা পলায়।

ফিরি তাদের পাছে পাছে, আমার কি অবসর আছে ?
বাপের বাড়ী ঘন আসা মোর দায় ॥

আলেয়া—একতালা।

তখন, উমায় করি কোলে, ভাসি নয়নজলে,
আবার সুধায় হিমালয়-গৃহিণী।
তুমি বিশ্বের মা, তা ত কেউ বলে না,
সবাই বলে তুমি গণেশজননী ॥
তুমি বল বিশ্বজোড়া তোমার বাস,
না দেখিলে কিসে করি তা বিশ্বাস
আমায় প্রবোধ দিতে কহ মিথ্যাভাষ,
আশ্বাস কি তাহে পায় পরাণী ॥
আশ্বাস না মানে জননীর অন্তর,
যাকে পাই তাই সুধাই নিরন্তর,
কেমন আছে আমার ভবানী,—
সবাই বলে ভাল, কেউ না বলে মন্দ,
অন্তরে আমার বাড়ায় কেবল সন্দ,
(কারণ) আমি ত সব জানি, কেমন ত্রিশূলপাণি,
কেমন ঘরে বাসা দিন-যামিনী ॥
কেহ কেহ বলে অন্নপূর্ণা তুমি,
তাই বা কিরূপে বিশ্বাস করি আমি,
(কারণ) সে কি ভিক্ষা করে, গৃহিণী যার ঘরে
অন্নপূর্ণা—অন্নাভাবহারিণী ॥
হও মা অন্নপূর্ণা, হও মা বিশ্বরাণী,
আমার উমা—আমি ইহাই জানি।
ভুলুয়া উঠিয়া বলে শুন "রাণি,
আমি জানি উমা মোর জননী ॥"

আলেয়া—একতালা ॥

হলি কেন মা চঞ্চলা এত ?
কেন তোর অন্তরে, সন্দেহ সঞ্চরে,
কেন মা তুই কান্দিস্ বল নিয়ত ?
সদানন্দ যাকে তুলি আপন বক্ষে,
সর্ব্বস্ব জ্ঞান করি করেন সদা রক্ষে,
ত্রিচক্ষু যাহাকে, দেখে মা এক লক্ষ্যে,—
দুঃখের মুখ সে দেখে না ত ॥
বৃথা সে নারদকে কেন মা দিস্ দোষ ?
তোদের পুণ্যফলে হলেন জামাই আশুতোষ।
(আবার) আমার সাধনায়, হইয়া সদয়,
বিশ্বনাথ হলেন আমার নাথ ॥
বিশ্বনাথকে পূজা যে দিতে আসে মা,
সেই ত অগ্রে করে আমার উপাসনা,
রাজরাজেশ্বরী ভিন্ন কেউ বলে না,
যে আসে হয় পদে অবনত ॥
বিশ্বনাথের ঘরে বিশ্বের অন্নদান,
তাইতে এখন আমার অন্নপূর্ণা নাম,
ভিখারী নন হর, বিশ্বের বিশ্বেশ্বর,
তোর ভুলুয়াত সব অবগত ॥

মঙ্গলারতি।

আনন্দে আনিয়া রাণী সর্ব্বতীর্থের জল।
কোলে করি ধোয়ায় স্বকরে পদতল।
কনক জড়িত মণিময় সিংহাসন,
তদুপরে যত্নে পাতে উমার আসন।

মণিময় রাজছত্র তদুপরে দিল।
তদুপরে চন্দ্রাতপ যত্নে টানাইল।
মণিময় মুকুট ভূষণ বাস আনি,
সাবধানে সযতনে পরায় আপনি।
প্রাণ উমায় মনের মতন সাজাইয়া,
বসাইল সিংহাসনে কোলে করি নিয়া।
সঙ্গিনী বিজয়া জয়া দুপাশে দাঁড়ায়।
গৌরীমুখ নিরখিয়া চামর ঢুলায়।
গোঘৃত-রচিত শত প্রদীপ লইয়া।
মঙ্গল-আরতি রাণী করে দাঁড়াইয়া॥
দীপালোকে ঝলমলে বসন ভূষণ,—
মণ্ডপে উদিল রবি শশী তারাগণ।
মেনকামন্দিরে রূপসিন্ধু উথলিল।
চৌদিকে মঙ্গলবাদ্য বাজিতে লাগিল।
মুনি ঋষি তপস্বী আরতি-গান করে,
স্তুতিগান করে সুরাসুরে জোড়-করে।
স্থাবর জঙ্গম নাচে আরতি হেরিয়া।
বোধ-বচন-মন হারায় ভুলিয়া॥

দেবর্ষি নারদের কীর্ত্তন।

মেনকামণিমন্দিরে নিন্দি কনকেন্দীবর,
শারদেন্দুনিভাননা দশভুজধারিণী হের॥
দশভুজধারিণী বটে—কিন্তু কর নিরীখন,
দশভুজে অনন্তভুজ প্রভা করিছে প্রকটন।
ওর অন্তহীন,ভুজ অন্তহীন দনুজ অন্তকর॥
বদন-মাধুরিমা হেরি মনে মনে স্বতঃই অনুভব,

কমনীয়-করুণায় গড়া তনু অযোনি-সম্ভব।
ওর অসম্ভব ত্রিনয়ন ত্রিতাপহর নিরন্তর॥
ভুলুয়া মনে অনুমানে ও শরণাগত-পালিকা।
শরণাগতে পালিতে তাই মহিষাসুর-নাশিকা।
ক্রোধ-মুরতি-অসুর হত সহিতে নারি পদভর॥

(নয়ন মুদ্রিত করিয়া।)

ইন্দ্র-নীলমণি-নিন্দিত-নির্ম্মল-নীল-ইন্দু-বরণা।
কাল-হৃদয়মণি-মন্দির-নিবাসিনী-নির্ম্মৎসর-শরণা।
চন্দ্র-সূর্য্য-তারা জ্যোতি-সমন্বিত,
নয়ন-নিন্দি-নভ-ভালে সমুত্থিত,
বিশ্বমূর্ত্তি ভবসুন্দরী শঙ্করী মুক্তাম্বর-বসনা॥
দীন-আর্ত্ত-ভয়-ভঞ্জিনী-রঞ্জিনী,
ক্ষমা-নির্ঝর দ্বিজপশূদধি-বর্দ্ধিনী।
সত্য-ধর্ম্ম-ন্যায়-লঙ্ঘক-দানব-মুণ্ডমাল-ভূষণা॥
ইন্দুভালী-মুখইন্দু নিরীখনে,
পরমানন্দে থির-আনমিখ-নয়নে,
পরমানন্দময়ী সাধক-সঙ্গতি বরাভয়-কর-শোভনা॥
অন্নপূর্ণা নিতি অন্ন বিতরণে,
পূর্ণ বারাণসি নিত্য নিমন্ত্রণে;
পাদপদ্ম-মধুলোলুপ-মধুকর প্রীতি নিতি কৃতকরুণা॥
তাপত্রয় করে মুক্তি লভিতে যদি,
চিত্তে বর্ত্তে আশ, বিশ্বাসি নিরবধি,
বিশ্বজননী-পাদপদ্ম হৃদয়ে কেন যত্নে ভুলুয়া ধরনা॥

সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী।

কামাখ্যার ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে থাকিতেন। পূর্ণানন্দ স্বামীর শিষ্য ছিলেন। কাশীর বিশুদ্ধানন্দ এবং ভাস্করানন্দ তাঁহার সতীর্থ। প্রথম জীবনে তিনি ও বিশুদ্ধানন্দ হায়দরাবাদের নিজামের সৈন্য বিভাগে সুবাদারী করিতেন। সিপাহী বিদ্রোহের কিছু পূর্ব্বে তাঁহারা উভয়েই নিরপরাধে দণ্ডিত হন। উভয়ে সংসারের অবিচার দর্শনে সংসার ত্যাগ করেন। বিশুদ্ধানন্দের বয়স তখন ত্রিশ বৎসর। তিনি তখন অধ্যয়নে নিযুক্ত হইয়া মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হন। পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, তাঁহার ছাত্র ছিলেন। নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী মা নাম মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভক্ত রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধি করেন। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত কামাখ্যায় ছিলেন।

হিন্দু ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বক্তা, খৃষ্টান ও ব্রাহ্ম স্রোত হইতে হিন্দু সমাজের রক্ষক, শক্তিমান সাধক পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী যখন গৌহাটী আসেন, তখন ব্রহ্মচারীদেবকে দর্শন করিতে তিনি গমন করেন। ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করেন, "এই নির্জ্জন পর্ব্বত শিখরে আপনি একেলা থাকেন,—আপনার ভয় করেনা?"

ব্রহ্মচারী— ভয় কি! মার কোলে থাকি।

পরিব্রাজক—আপনার মাকে কি আপনি দেখিতে পান?

ব্রহ্মচারী— অন্ধ ছেলে মার কোলে থাকে, মার হাতেই পানাহার করে। কিন্তু মাকে সে দেখিতে পায় না। আমি মার অন্ধ ছেলে।

পরিব্রাজক ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া গমন করিলেন।

স্বামী শ্যামানন্দ সরস্বতী বলিয়াছিলেন—ভাই, তুমি খুব সুখে আছ।

ব্রহ্মচারী—তুমি কি দুঃখে আছ? তুমি শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের সঙ্গে আছ। প্রত্যহ তাঁহাকে সেবা-বন্দনার অধিকারে আছ। সাধক-জীবনের যাহা প্রধান সম্পত্তি তুমি তাহার মালিক হইয়াছ। আর আমি এই নির্জ্জন স্থানে নির্বোধের মত আছি। অথচ আমার সুখ তোমার সহ্য হয় না?

স্বামী শ্যামানন্দ সরস্বতী নির্ব্বাক রহিলেন!

গৌহাটীর গবর্ণমেণ্ট উকিল বাবু কালীচরণ সেন মহাশয়ের প্রতি ব্রহ্মচারীর অত্যন্ত স্নেহ ছিল। তাঁহার পিতৃদেব শ্রীমন্তলাল সেন দীর্ঘকাল ব্রহ্মচারীর আহার্য্য প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী প্রত্যহ রাত্রি দশটার পরে পর্ব্বত হইতে নামিয়া কালীচরণবাবুর বাসায় যাইতেন। মহাপুরুষগণের এরূপ কৃপা যাঁহারা লাভ করিতে পারেন তাঁহাদের কখন অমঙ্গল ঘটে না।

১৩০৪ সালের ভূমিকম্পের ইতিহাস বঙ্গদেশ ও আসামবাসী সুদীর্ঘকাল স্মরণ রাখিবে। ভূমিকম্পের সময় যখন ঘর বাড়ী সমস্ত ভূমিসাৎ হইতে লগিল, ভূপৃষ্ঠ ঘনকম্পনে জীবজগতের অতিষ্ঠনীয় হইল, তখন ব্রহ্মচারী আপনার স্নেহময়ী জননীর জন্য অস্থির হইয়া পড়িলেন। মা ভুবনেশ্বরীর মন্দির ঝঞ্ঝাসঞ্চালিত বিটপীর মত দোলায়মান হইতে লাগিল। ব্রহ্মচারী তখন আত্মজ্ঞান হারা হইয়া ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং মাকে রক্ষা করিতে ভুবনেশ্বরীর মহাপীঠ আপন বক্ষস্থলে রাখিয়া তাহার উপরে উপুর হইয়া পড়িয়া থকিলেন। কিছুক্ষণ পরে মন্দির ব্রহ্মচারীর উপরে পতিত হইয়া ভূমিসাৎ হইল।

ধন্য অধিকার! ধন্য বাৎসল্যভাব! ধন্য ব্রহ্মচারীর সুনির্গুণ যোগভক্তি! ভগবানের প্রতি যখন ভক্তের এইরূপ ভাব হয়, তখন তাঁহাকে মহাভাবের অধিকারী বলে। আত্মসুখ-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, আপন কল্যাণ পরিত্যাগ করিয়া, আপন প্রাণের কথা বিস্মৃত হইয়া, মাত্র ভগবানের সুখের জন্য, ভগবানের কল্যাণের জন্য, ভগবানের প্রাণ রক্ষার জন্য, যখন ভক্তের ঐকান্তিক চেষ্টা হয়, তখনি পূর্ণ প্রেমের অমিয়মাখা মাধুর্য্যরসে তিনি অধিকারী হন। দাস্য রসের মাধুর্য্য হনুমানদেব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সখ্যরসের মাধুর্য্য ব্রজবালকেরা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বাৎসল্যরসের মাধুর্য্য নন্দ যশোদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং মধুররসের মাধুর্য্য ব্রজগোপীরা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যিনি পরমপুরুষ পরমেশ্বর, তাঁহাকে তাঁহারা রক্ষণীয় মনে করিতেন। পাছে কৃষ্ণের অমঙ্গল ঘটে, সেই ভয়ে নন্দ যশোদা আত্মহারা। কৃষ্ণ যে জগৎপালক জগৎরক্ষক, এ জ্ঞান তাঁহাদের নাই; তাঁহাদের জ্ঞান তাঁহাদের কৃষ্ণ; তাঁহাদের কৃষ্ণ তাঁহারা রক্ষা না করিলে কে রক্ষা করিবে।

আজ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারীরও সেই ভাব—সেই মহাভাব! সেই ভাবে তিনি আত্মহারা। মা ভুবনেশ্বরী যে ত্রিভুবন-রক্ষাকারিণী, ত্রিলোকতারিণী, এ জ্ঞান তাঁহার লুপ্ত হইয়াছে। তিনি জানিয়াছেন মা কেবল তাঁহারই মা, আর মায়ের রক্ষক কেবল একা তিনি। শুদ্ধাভক্তির পরিণাম ফল এইরূপই বটে!! যাহার হইয়াছে সে জানিতে পারে নাই—যে বুঝিয়াছে সে ভাবিয়া আত্মহারা হইয়াছে। মানুষ কত উন্নত হইতে পারে—মানুষ কত পরিবর্ত্তিত হইতে পারে! সে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইয়া পরমপুরুষের রক্ষক হয়! বলিহারি ভক্তির সাধনা, আর বলিহারি ভক্ত!!

প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ হইল। হাজার হাজার লোক ভুবনেশ্বরীর প্রাঙ্গনে সমবেত হইল। সকলে ভাবিল, ব্রহ্মচারীর

সেই প্রস্তরের আঘাতে কর্দ্দমে পরিণত হইয়াছে। সকলে প্রস্তরখণ্ড সরাইতে লাগিল, দেখা গেল ব্রহ্মচারীর দেহ কঠিনতর প্রস্তর খণ্ডের মত প্রস্তররাশির মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। সকলে "জয় মা ভুবনেশ্বরীর জয়, জয় নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের জয়" বলিয়া তারস্বরে পর্ব্বত ঝঙ্কারিত করিতে লাগিল। কিছু দিন পরে দ্বারবঙ্গের মহারাজকে মন্দির সংস্কারের জন্য তিনি আদেশ করিলেন। মহারাজ বাহাদুর নয় হাজার টাকা খরচ করিয়া ভুবনেশ্বরীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

একদিন দ্বারবঙ্গের মহারাজ ব্রহ্মচারীকে একশত টাকা ইচ্ছামত খরচের জন্য প্রদান করিলেন। তখন তিনি কালীবাবুকে ডাকিয়া কোন সাধুকর্ম্মে তাহা খরচ করিতে প্রদান করিলেন।

একমাত্র নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারীর জন্য কামাখ্যা যেন পরিপূর্ণ ছিল; তাঁহার অবসানে কামাখ্যা যেন শূন্য হইয়াছে। বোধ হয় যেন মা আছেন,—কিন্তু কোলে সন্তান নাই। ব্রহ্মচারী দেহত্যাগের পূর্ব্বে বাতরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীকামাখ্যা ৷

মহাতীর্থ কামরূপ ক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম কামাখ্যা। যে মনোরম পর্ব্বতশিখরে তাঁহার মণিময় রত্নসিংহাসন, তাঁহার নাম নীলাচল। আর তাঁহার পাদদেশ বিধৌত করিয়া, উভয় তীরস্থ পার্ব্বত্য নগর গ্রাম সম্বলিত বনভাগকে তরঙ্গ কল্লোলে প্রতিধ্বনিত করিয়া, যে সুপবিত্র সুবিস্তৃত সলিলধারা প্রবাহিত, তাহার নাম ব্রহ্মপুত্র।

কামরূপ ক্ষেত্র অতি প্রাচীন কাল হইতে আর্য্য সাধক সম্প্রদায়ে যেমন মহাতীর্থ বলিয়া প্রশংসিত, তেমনি সুবিস্তৃত, সমুন্নত ও সমৃদ্ধি-সম্পন্ন রাজ্য বলিয়া পুরাণাদিতে প্রচারিত। কামরূপেরই নাম প্রাগ-জ্যোতিষপুর। এই পবিত্র ক্ষেত্রের নাম কামরূপ কেন হইল, তাহার উত্তর শ্রীশ্রীকালিকাপুরাণ ও যোগিনীতন্ত্রে এইরূপে বর্ণিত আছে।

শম্ভুনেত্রাগ্নিনির্দ্দগ্ধঃ কামঃ শম্ভোরণুগ্রহাৎ।
তত্র রূপং যতঃ প্রাপ্তং কামরূপং ততোঽভবেৎ॥

"দেব দেব শম্ভুর নয়নানলে ভস্মীভূত হইয়া কামদেব এইস্থানে সেই শম্ভুর কৃপায় তাঁহার পূর্ব্ব অবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তজ্জন্য এই ক্ষেত্রের নাম "কামরূপ"!

পুনঃ শ্রীশ্রীযোগিনীতন্ত্রে :—

কৃতে কর্ম্মাণি সিধ্যেত কামনাস্তু সুরেশ্বরি!
ততে মর্ত্ত্যাঃ কামরূপমিতি রূপমকল্পয়ৎ॥

"হে সুরেশ্বরি! এই পুণ্যক্ষেত্রে মানুষ কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান মাত্র কাম্যফল লাভে কৃতার্থ হয়, তজ্জন্য এই পুণ্যক্ষেত্র কামরূপ নামে অভিহিত।"

উভয় গ্রন্থের নামাকরণে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচারিত হইলেও উভয়ই গ্রহণযোগ্য। কামদেব হর কোপানলে ভস্মীভূত হইয়া এই স্থানেই পুনর্ব্বার দেহ লাভ করিয়াছিলেন, কামদেব নির্ম্মিত সুপ্রাচীন মন্দিরই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আর অতি প্রাচীন কাল হইতে মন্ত্রসিদ্ধির জন্য কামরূপ সুপ্রসিদ্ধ। সাধকগণ কাম্যফল লাভের জন্য অতি প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত এই কামরূপে সাধনাসন পাতিয়া আসিতেছেন!

মন্ত্রসিদ্ধির সর্ব্বোত্তম ক্ষেত্র কামরূপের সীমা নির্দ্দেশ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীকালিকাপুরাণে এইরূপ বর্ণনা আছে :—

"করতোয়া নদী পূর্ব্বং যাবদ্দিকরবাসিনীম্।
ত্রিংশৎ যোজনবিস্তীর্ণং যোজনৈকশতায়তম্।
ত্রিকোণং কৃষ্ণবর্ণঞ্চ প্রভুতাচলপূরিতম্।
নদীশত সমাযুক্তং কামরূপং প্রকীর্ত্তিতম্॥

"কামরূপের পশ্চিম সীমা করতোয়া নদী। (বগুড়ার অন্তর্গত রাজা রামকৃষ্ণের ভবানীপুর এই করতোয়ার তীরে। পাবনার অন্তর্গত চাটমহরের পশ্চিম সীমা দিয়া এই করতোয়া প্রবাহিতা। তাহা হইলে পাবনা বগুড়া পর্য্যন্ত কামরূপ ক্ষেত্র বিস্তৃত।) পূর্ব্ব সীমা দিক্করবাসিনী। (এই নদী দিব্রুগড়ের মধ্যে; বর্ত্তমান নাম দিক্রাং নদী।) এই কামরূপ ক্ষেত্র একশত যোজন দীর্ঘ ও ত্রিশ যোজন বিস্তৃত। ইহা ত্রিকোণ, কৃষ্ণবর্ণ এবং অগণ্য পর্ব্বত সমন্বিত। ইহার মধ্যে এক শত নদী প্রবাহিতা।"

শ্রীশ্রীযোগিনীতন্ত্রে লিখিত আছেঃ—

"করতোয়াং সমাশ্রিত্য যাবদ্দিকরবাসিনীম্।
উত্তরস্যাং কঞ্জগিরিঃ করতোয়াং তু পশ্চিমে।
তীর্থশ্রেষ্ঠা দিক্ষুনদী পূর্ব্বস্যাং গিরিকন্যকে।
দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রস্য লাক্ষায়া সঙ্গমাবধি।
কামরূপমিতি খ্যাতং সর্ব্বশাস্ত্রেষু নিশ্চিতম্।
ত্রিংশৎ যোজনবিস্তীর্ণং দীর্ঘেন শত যোজনম্।
কামরূপং বিজানীহি সুরাসুর-নমস্কৃতং॥"

"হে গিরিকন্যকে! কামরূপের সীমা পশ্চিমে করতোয়া হইতে পূর্ব্বে দিক্করবাসিনী পর্য্যন্ত। তাহার উত্তর সীমা কঞ্জ পর্ব্বত, পশ্চিম সীমা করতোয়া; পূর্ব্ব সীমা তীর্থশ্রেষ্ঠা দিক্ষুনদী (দিক্রাং নদী); দক্ষিণ সীমা ব্রহ্মপুত্র ও লক্ষার (শীতা লক্ষার) সঙ্গমস্থল। তাহা একশত যোজন দীর্ঘ ও ত্রিশ যোজন বিস্তৃত। সেই পবিত্র ক্ষেত্র সুরাসুর সকলেরই নমস্য।"

এই কামরূপ ক্ষেত্র চারিভাগে বিভক্ত। (১) কামপীঠ; (২) রত্নপীঠ; (৩) স্বর্ণপীঠ; (৪) সৌমারপীঠ।

(১) কামপীঠ—যেখানে কামাখ্যা দেবীর সিংহাসন তাহার নাম কামপীঠ; স্বর্ণকোষ নদ হইতে কামরূপ জেলার অন্তর্গত রূপিকা নদী পর্য্যন্ত এই কামপীঠ ক্ষেত্র।

(২) রত্নপীঠ—যে স্থানে জলেশ্বর শিব আছেন তাহার নাম রত্নপীঠ। করতোয়া হইতে স্বর্ণকোষ নদ পর্য্যন্ত রত্নপীঠ।

(৩) স্বর্ণপীঠ—রূপিকা নদী হইতে তেজপুরের পূর্ব্বস্থা ভৈরবী নদী পর্য্যন্ত ক্ষেত্রের নাম স্বর্ণপীঠ।

(৪) সৌমারপীঠ—ভৈরবী নদী হইতে সাদিয়ার উত্তর দিকে প্রবাহিতা দিক্করা নদী পর্য্যন্ত ক্ষেত্রের নাম সৌমারপীঠ। এই স্থানে দিক্করবাসিনী দেবী আছেন।

মন্দির নির্ম্মাণ।—দেবদেব বিশ্বনাথের কৃপায় ভস্মীভূত কামদেব পুনর্ব্বার নিজ দেহ লাভ করেন। বিশ্বজননী শ্রীশ্রীকামাখ্যা দেবীর অপার মহিমা উপলব্ধি করিয়া তিনি তাঁহার মন্দির নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হন। বহু পরিশ্রমে সুকঠিন বিশুদ্ধ প্রস্তরসমূহ সংগ্রহ করেন, এবং মাতৃকা যন্ত্রের উপরে মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এই মন্দিরের গাত্রে অষ্টাদশ ভৈরবের প্রস্তরমূর্ত্তি সন্নিবিষ্ট; এবং মন্দিরের গঠনকারী প্রস্তরসমূহ ইস্পাতের অর্গলে সন্নিবদ্ধ। এই মন্দিরের উপরিভাগ সম্ভবতঃ কোন কালবিপ্লবে ধ্বংশ হইয়া যায়, এবং ইহার উপরে এক বটবৃক্ষ উৎপন্ন হয়। প্রকৃত মন্দির মাটীর ঢিপীতে আবৃত হয়। কত কাল এই মন্দির এই ভাবে মাটীর নিম্নে ছিল, তাহা নির্ণয় করিতে কাহারো সাধ্য নাই।

রায় বাহাদুর গুণাভিরাম বড়ুয়া আসামী ভাষায় আসামের ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। তাহা আসাম "বুরঞ্জি" নামে অভিহিত। শ্রীশ্রীকামাখ্যা দেবীর মন্দিরের পুনরুদ্ধার সম্বন্ধে তাহাতে

লেখা আছে। মন্দিরের পুনরুদ্ধার সম্বন্ধে জনপ্রবাদও আছে। আমরা উভয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

"কোচবেহারের কোন মহারাণী দেবদেব বিশ্বনাথকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করেন। দেবদেব বিশ্বনাথ বরদান করিতে আবির্ভূত হইলে তিনি শিবশক্তি সমন্বিত মহাবল পুত্র কামনা করেন। কিছুকাল পরে তাঁহার গর্ভে বিশু ও শিশু নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কাল-ক্রমে তাঁহারা বিশ্বসিংহ ও শিবসিংহ নামে পরিচিত হন।

বিশ্বসিংহ প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি হইয়া ছিলেন; শিবসিংহ সেনা-পতি হইয়া তাঁহার রাজ্যবিস্তারে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা কমতাপুর অধিকার করিলেন;—অন্যান্য ম্লেচ্ছ ও কোচ রাজগণকে পরাজিত করিয়া তাহাদের রাজ্য কাড়িয়া লইলেন;—এবং শেষে সসৈন্যে গৌহাটীর দিকে অগ্রসর হইলেন। একদিন দুই ভাই জঙ্গল ভ্রমণে বাহির হইলেন; কিছুদুর গমন করিয়া সঙ্গীহারা হইলেন; এবং ঘুরিতে ঘুরিতে কামাখ্যার নীলাচলে আরোহণ করিলেন। তখন নীলাচলে মাত্র দুই চারি ঘর ম্লেচ্ছ বাস করিত। তাঁহারা পিপাসার্ত্ত হইয়া তাহাদের পল্লীতে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু কোন পুরুষের সঙ্গে দেখা হইল না; এক বটবৃক্ষমূলে এক বৃদ্ধাকে দর্শন করিলেন। সে জল দান করিয়া উভয় ভ্রাতার তৃষ্ণা নিবারণ করিল।

বিশ্বসিংহ জিজ্ঞাসা করিলে সেই বৃদ্ধা কহিল, "ইহা আমাদের দেবতার স্থান; এই মাটীর নীচে দেবতার মন্দির আছে।" বিশ্ব-সিংহ ভগবানে বিশ্বাসী ও ভক্তিমান ছিলেন। তিনি অনুচরবর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া আপনাকে বড় বিপন্ন বোধ করিলেন। তিনি সেই বটবৃক্ষমূলে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া দেবতার নিকটে অনুচর-বর্গের পুনর্মিলন প্রার্থনা করিলেন। অতি অল্পক্ষণ পরেই তাহার অনুচরবর্গ সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার বিস্ময়ের অবধি থাকিল না।

তিনি দেবতার পূজার পদ্ধতি জানিতে চাহিলে বৃদ্ধা কহিল, "এই স্থানে শাস্ত্রবিহিত ছাগাদি পশু বলি দিতে হয়; দেবতার পরিধান জন্য উত্তম বসন, শাঁখা সিন্দুর ইত্যাদি উপহার দিতে হয়।" বিশ্বসিংহ তখন এই স্থানকে শক্তিপূজার স্থান বলিয়া অনুমান করিলেন।

তিনি পররাজ্য ধ্বংশ ও আত্মসাৎ করিয়া বহু বৈরী সৃজন করিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকারের মধ্যে নানাস্থানে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। তিনি সর্ব্বদা ত্রাসযুক্ত হইয়া কালযাপন করিতেন। অশান্তি তাঁহার অন্তরের সঙ্গী ছিল,—অন্তরঙ্গও তাঁহার সন্দেহের বিষয়ীভূত ছিল। তিনি সম্রাট হইয়াও সর্ব্বদা মহাভয়ে ম্রিয়মান থাকিতেন। তাই তিনি দেবীর দুয়ারে প্রার্থনা করিলেন, "যদি আমার প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে;—আমার রাজ্য মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়; এবং পরাজিত নৃপতিবৃন্দ বৈর ত্যাগ করে, তাহা হইলে আমি মৃত্তিকার নিম্ন হইতে মন্দির বাহির করিব,—স্বর্ণখণ্ড দ্বারা তাহার সংস্কার করিব এবং নিত্যপূজার ব্যবস্থা করিব।

তিনি কোচবেহার ফিরিয়া আসিলেন। অতি অল্পকাল মধ্যে তাঁহার রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইল। তিনি দেবতার করুণা পদে পদে উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। তখন তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী আহ্বান করিয়া সভা মিলাইলেন, এবং নীলাচলের দেবস্থান সম্বন্ধে শাস্ত্রসম্মত তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। পণ্ডিতমণ্ডলী নীলাচলকে কামপীঠ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন।

মহারাজ বিশ্বসিংহ নীলাচলে গমন করিয়া বটবৃক্ষ ছেদন করিলেন। মৃত্তিকার স্তূপ কাটিয়া উঠাইয়া ফেলিলেন। তখন কামদেব নির্ম্মিত মন্দিরের নিম্নাংশ এবং যোনিপীঠ বাহির হইয়া পড়িল। শ্রীশ্রীযোগিনী তন্ত্রানুসারে তখন তিনি অন্যান্য পীঠও আবিষ্কার করিলেন। মন্দিরের উপরাংশ পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করিলেন। স্বর্ণখণ্ডে নির্ম্মাণ করিবার

কথা ছিল ;—তাহা অসাধ্য হইল ; তখন প্রত্যেক ইটের সঙ্গে এক রতি করিয়া স্বর্ণ দিয়া মন্দিরের চূড়া নির্ম্মিত হইল। ইহাই গুণাভিরামের বুরঞ্জির বিবরণ।

মুসলমান সম্রাট আওরংজেবের প্ররোচনায় কালাপাহাড় ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। সে মন্দিরের উপরাংশ কামানে উড়াইয়া দেয়। সেই সময় বিশ্বসিংহের পুত্র মল্লধ্বজ (অন্য নাম নরনারায়ণ) রাজা ছিলেন। তিনি মন্দিরের উপরাংশ আবার নির্ম্মাণ করেন। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ করিয়া ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করেন। তিনি কামাখ্যার সমস্ত মন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। আজ পর্য্যন্ত তাঁহার নির্ম্মিত মন্দিরাংশ কামদেব নির্ম্মিত মূল মন্দিরের উপরিভাগে দৃশ্যমান।

মহারাজা নরনারায়ণের মূর্ত্তি প্রবেশ মন্দিরের দেওয়ালে,—কামেশ্বর কামেশ্বরীর সম্মুখভাগে, খোদিত রহিয়াছে। বলা বাহুল্য নরনারায়ণের নাম ভিন্ন, তাঁহার রূপের সঙ্গে সে মূর্ত্তির কোন সাদৃশ্য নাই। নরনারায়ণের কনিষ্ঠ সহোদর শুক্লধ্বজ, (অন্য নাম চিলা নারায়ণ)। তাঁহার মূর্ত্তিও সেই দেওয়ালে অঙ্কিত আছে। কামাখ্যার বর্ত্তমান পাণ্ডাগণ মহারাজা নরনারায়ণ কর্ত্তৃক জগজ্জননীর সেবার্চ্চনার জন্য নানাস্থান হইতে আনিত ও উপনিবিষ্ট।

নীলাচলে আরোহণ করিবার সোপানশ্রেণী অতি প্রাচীনকালে নরকাসুর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। নরকের পুত্র ভগদত্ত কৌরব পক্ষে যুদ্ধ করিয়া কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে নিহত হন।

নরকাসুরের সম্বন্ধে গুণাভিরামের বুরঞ্জিতে এই মর্ম্মে লিখিত আছে,—মহারাজ নরক এই স্থানে রাজত্ব করিতেন। তিনি শ্রীশ্রীকামাখ্যাদেবীর মহিমা দর্শন করিয়া তাঁহার শরণাগত হন। কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। তপস্যায় জগজ্জননীর কৃপাদর্শন

লাভ করেন। কৃপা লাভ করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। এবং অক্ষুণ্ণ প্রতাপে রাজত্ব করিতে থাকেন।

রাজৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া নরক দম্ভ দর্পে অন্বিত হইলেন। আহার বিহারে আসুরিক ভাব অবলম্বন করিলেন। ক্রমে রাক্ষসপ্রকৃতি হইলেন। গর্ভিণীর গর্ভ চিরিয়া সন্তান দেখিয়া কৌতূহল তৃপ্ত করিতে লাগিলেন। দুর্দ্ধর্ষ হইলেন। লোকনাশের কারণ হইলেন। মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিলেন। তখন ভক্তিমান তপস্বী নরক, নরকাসুর নামে অভিহিত হইলেন। তাঁহার বিনাশসাধন প্রয়োজন হইল।

বিশ্ববিমোহিনী মায়ায় তিনি বিমূঢ় হইলেন। মা বিশ্বজননী এক মোহিনীমূর্ত্তিতে তাঁহাকে দর্শন দিলেন। তিনি মোহবিমূঢ় হইয়া মাকে বিবাহ করিতে উন্মত্ত হইলেন। উন্মাদের সংকল্প শুনিয়া দেবী বলিলেন, "তুমি যদি এই পর্ব্বতে উঠিবার জন্য চারিদিকে চারিটী সিঁড়ী ও একটী সুরম্য মন্দির এক রাত্রের মধ্যে নির্ম্মাণ করিতে পার, আমি তোমার সঙ্গে বিবাহ বসিতে পারি।"

মোহান্ধ নরক মহোৎসাহে নীলাচলে উঠিবার সিঁড়ী নির্ম্মাণে নিযুক্ত হইলেন। একটা সিঁড়ী শেষ হইলেই কুক্কুট ডাকিয়া উঠিল। নরক মনে করিলেন, রাত্রির শেষ হইয়াছে। ভ্রান্তিরূপিণী তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূতা হইলেন। তিনি সন্ত্রস্ত হইলেন। দেবী বলিলেন, "তবে আর কি হইবে? রাত্রি শেষ হইল, অথচ তোমার প্রতিশ্রুতি অনুসারে কার্য্য হইল না।" বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন।

নরক নিরাশ হইয়া ক্রোধান্ধ হইলেন। শব্দকারী কুক্কুট অন্বেষণ করিয়া বাহির করিলেন। এবং তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। আজ পর্য্যন্ত সেই স্থানকে "কুকরা কাটা" বলে। বেলতলার নিকটে নরকের রাজধানী ছিল। আজ পর্য্যন্ত তাহাকে "নরক পর্ব্বত" বলে। কামাখ্যার রেল লাইনের পরপার্শ্বের পর্ব্বত নরকের বিলাসভবন ও বিচারালয় ছিল। বিশ্বজননীর আদেশে

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কামাখ্যায় আসিয়া নরককে সংহার করেন। নরকের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ভগদত্ত কামাখ্যার রাজ সিংহাসনে আসীন হন।

গৌহাটীর পরপারে অশ্বাক্রান্ত। পাণ্ডববাহিনী এই পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। অশ্বারোহী সৈন্য এই পর্য্যন্ত আসিয়াছিল বলিয়া ইহার নাম অশ্বাক্রান্ত। এই স্থানে কূর্ম্মরূপী নারায়ণের মন্দির আছে।

কুরুক্ষেত্রের মহাপ্রলয়ে সমস্ত ভারত ধ্বস্তবিধ্বস্ত হইয়াছিল। বহু রাজধানী শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। কামাখ্যার মন্দিরও মৃত্তিকা স্তূপে আবৃত হইয়া বিলুপ্ত হইয়াছিল। শেষে কোচবেহার নরপতিগণই লীলাময়ীর কৌশলে কামাখ্যাতীর্থের পুনরুদ্ধার করেন। অথচ তাঁহাদের কামাখ্যা প্রবেশ নিষিদ্ধ। এই নিষেধ সম্বন্ধে এই রূপ জনপ্রবাদ আছে—

মহারাজা মল্লধ্বজের সময় কেন্দু কলাই নামে এক ব্রাহ্মণ মহাদেবীর পূজা করিতেন। তাহার ভক্তি ও তপস্যায় তিনি মহাদেবীর কৃপাপাত্র হন। মহাদেবী জ্যোতির্ম্ময়ীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সন্ধ্যা আরতির সময় তাঁহাকে দর্শন দিতেন। মা কুমারীমূর্ত্তিতে নৃত্য করিতেন, কেন্দু কলাই মৃদঙ্গ বাজাইতেন।

মহারাজা মল্লধ্বজ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া দেবীর দর্শনে কৃতার্থ হইতে কৃতসংকল্প হইলেন। নিষ্কিঞ্চন ভক্ত কেন্দু কলাইকে পরম যত্নে অভ্যর্থনা করিলেন; এবং "যেরূপেই হউক, অন্ততঃ এক নিমিষের জন্যও মাকে দেখাইতে হইবে" বলিয়া বিনয়পূর্ণ বাক্যে অনুনয় করিতে লাগিলেন।

কেন্দু কলাই রাজার প্রার্থনা শুনিয়া কিছুক্ষণ নীরবে রহিলেন; পরে বলিতে লাগিলেন,—"যাহা অহৈতুকী ভক্তি ও কঠোর তপস্যা ভিন্ন পাওয়া যায় না, তাহা কেহ কাহাকেও দিতে পারে না। তুমি

উপস্বী হও, ভক্ত হও, ভক্ত হইয়া সেই ত্রিভুবনমোহিনীকে প্রসন্না কর; তাঁহার অলোকসামান্যা রূপমাধুরিমা দর্শন কর। কৌশল করিয়া দেখিতে বা দেখাইতে বসিলে উভয়েরই বিপদ ঘটিতে পারে। অনুকূলা দৈবীশক্তি প্রতিকূলা হইতে অধিকক্ষণ লাগে না।

মহারাজা মল্লধ্বজ সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিতে প্রাণপণে যত্ন আরম্ভ করিলেন। যিনি বিষয়বিরাগী নিস্পৃহ, তাঁহার সম্মুখে ধনরত্নের মোহজাল বিস্তৃত করিলেন। তাঁহার স্ত্রী পুত্রাদিগকে বহুমূল্য বসনভূষণ দান করিতে লাগিলেন। নানারূপ ভোগ্য বস্তু নিত্য উপঢৌকন দিতে লাগিলেন। কিছুদিন মধ্যেই বৈরাগীকে ভোগী করিয়া উঠাইলেন। কনকের কুহকে কেন্দু কলাই কর্ত্তব্যে বিচলিত হইলেন। মহারাজকে বলিলেন, "সান্ধ্য আরতির সময় মা অনুপম কিরণে মণ্ডপ উদ্ভাসিত করিয়া আবির্ভূতা হন; তুমি গবাক্ষদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার ভুবনভরা রূপ দর্শন করিও"।

মল্লধ্বজ সন্তুষ্ট হইলেন। সন্ধ্যা আসিল। মন্দিরে যাইয়া কেন্দু কলাই আরতি করিতে বসিলেন। মহারাজা নাচ ঘরে দাঁড়াইয়া, গবাক্ষ দিয়া, অনিমিষ নয়নে মন্দিরের ঘটনা দর্শন করিতে লাগিলেন। সহসা মন্দিরের মধ্যভাগ দিব্যালোকে উদ্ভাসিত হইল। নুপুর-শিঞ্জনের সুমধুর ধ্বনি মহারাজার শ্রুতিগোচর হইল। কর্ণকুহরে যেন অমৃতের স্রোত প্রবেশ করিল। তিনি ভয়ে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইলেন।

সহসা বিকট বজ্রধ্বনির মত ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থিত হইল। সে দিব্যালোক অন্তর্হিত হইল। মন্দির অন্ধকারে পূর্ণ হইল। কে যেন এক চপেটাঘাতে কেন্দু কলাইকে ছিন্নশির করিল। আর মহারাজা মল্লধ্বজকে লক্ষ্য করিয়া আকাশবাণী হইল, "আজ হইতে তুই কিংবা তোর কোন বংশধর এই মহাপীঠ দর্শন বা স্পর্শ করিতে পারিবে না।

এমন কি, এই পর্ব্বতে উঠিতেও পারিবে না। উঠিলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।” মহারাজা মর্ম্মাহত হইয়া রাজধানীতে গমন করিলেন। তদবধি কোচবেহারের আর কোন মহারাজা এই তীর্থে গমন করেন না।

তারপরে কামরূপক্ষেত্র সেন বংশের অধিকৃত হয়। সেন বংশের মধ্যে নীলধ্বজ, চক্রধ্বজ, নীলাম্বর এই তিন রাজার নাম ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। সেন বংশের পরে পাল বংশ। পাল বংশের গোপাল, ধর্ম্মপাল, জয়পাল এই তিন জনের নাম প্রসিদ্ধ। পাল বংশের পরে ছুটিয়া বংশ। এই বংশের বিশেষ কোন খ্যাতি প্রতিপত্তির কথা শুনা যায় না। ছুটিয়ার পরে আহম রাজার আগমন। আহম রাজগণ প্রতাপশালী ছিলেন। তাঁহাদের নামানুসারে এই প্রদেশ “আসাম” নামে পরিচিত হয়। আসামের নাম কামরূপ ছিল।

আহম জাতির মধ্যে শান ও মান জাতি ব্রহ্মদেশ হইতে আসিয়া উপর আসাম (Upper Assam) আক্রমণ করে। শান জাতির প্রথম রাজা চুকাফা। শানের পরে মান জাতির রাজত্ব। জয়মতী মান জাতিয়া। জয়মতীর বৃত্তান্ত আসাম ইতিহাসে একটা প্রধান বিষয়। জয়মতীর গৌরব রক্ষার্থ জয়সাগর খনিত হয়। শিবসাগর জয়সাগর আসাম প্রদেশের অতি মনোরম দৃশ্য। জয়মতীর পুত্র রুদ্রসিংহ; রুদ্রসিংহের পুত্র শিবসিংহ; শিবসিংহের পুত্র লক্ষ্মীসিংহ; লক্ষ্মীসিংহের পুত্র রাজেশ্বর সিংহ ও গৌরীনাথ সিংহ। এই গৌরীনাথ সিংহ কামাখ্যায় লক্ষবলি দান করেন। রাজেশ্বর সিংহ নাটমন্দিরের সংস্কার করেন। শিবসিংহ কামখ্যার অনেক মন্দির নির্ম্মাণ করেন; এবং কামাখ্যার সেবা পূজা তাঁহার বিধান অনুসারে আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে।

গৌহাটীর সুনামধন্য পরমধার্ম্মিক উকীল শ্রীযুক্তকালীচরণ সেন রায় বাহাদুরের স্বর্গীয় পিতৃদেব শ্রীমগুলাল সেন মহাশয়, জনসাধারণের

নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া এবং নিজেও অনেক অর্থ প্রদান করিয়া কামাখ্যার অনেক সংস্কার করিয়াছিলেন। মন্দিরের চূড়া, চারি পার্শ্বের প্রাচীর, পর্বতে উঠিবার সময় যে তিনটী সিংহদ্বার অতিক্রম করিতে হয় তাহা, কামেশ্বরী, ধূমাবতীর মন্দির, ভৈরবী কুণ্ড, বলিদানের ঘর এবং নাটমন্দিরের মধ্যভাগ ইত্যাদির সংস্কার করেন।

১৩০৪ সালের ৪ঠা আষাঢ়ের ভূমিকম্পে কামাখ্যার অনেক মন্দির ধ্বংস হয়। দ্বারবঙ্গের ধর্ম্মপরায়ণ মহারাজা রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর নিম্নলিখিত মন্দিরসমূহ পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করেন—"ভুবনেশ্বরীর মন্দির, তারাবাড়ী, কালীবাড়ী, কামেশ্বরের মন্দির, সিদ্ধেশ্বরের মন্দির, ভৈরবী কুণ্ড, সৌভাগ্য কুণ্ড, অমৃত কুণ্ড, ঋণমোচন কুণ্ড, দুর্গা কুণ্ড, ও গয়া কুণ্ড।"

বর্ত্তমান সময়ে অম্বুবাচী ও দুর্গোৎসবের সময়ই কামাখ্যায় বহু যাত্রীর সমাগম হয়। ভাদ্র মাসের ১লা ও ২রা দুই দিন "দেবধ্বনি" উৎসব হয়। এই উৎসবে বৈচিত্র্য আছে। কামাখ্যা, ভুবনেশ্বরী, টোকোরেশ্বর, মনসা, শীতলা ও কালীবাড়ী প্রভৃতি মন্দির হইতে যোগিনীর দৃষ্টি কালিতা জাতীয় লোকের উপরে পতিত হয়। যে সকল লোক দেবধ্বনির একমাস পূর্ব্ব হইতে সংযমে থাকে তাহারাই কেহ কেহ যোগিনীর কৃপাদৃষ্টি লাভ করে। তাহারা সংযমে হবিষ্যান্ন ভোজন করে, ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থান করে, মিথ্যালাপ ত্যাগ করে। যাহাদের উপরে যোগিনীর দৃষ্টি পতিত হয় তাহারা এই দুই দিন আত্মহারা ভূতেধরার মত হয়। এই দুই দিন তাহারা আম-মাংস সন্দেশ ও ডাবের জল খায়। তাহারা শানিত খড়্গের উপরে নৃত্য করে, নাচঘরে নৃত্য করে, লোকের ভবিষ্যৎ সুখদুঃখের কথা বলিতে থাকে। নাচিবার সময় ঢোল বাজায়। ভবিষ্যদ্বাণী অনেক সময় সত্য হয়।

কামাখ্যায় কামেশ্বর ও কামেশ্বরী, এবং কালীবাড়ীর কালী ভিন্ন

আর কোথাও প্রতিমা নাই। সর্ব্বত্রই যোনিপীঠ। এই সকল যোনিপীঠ সম্বন্ধে কালিকাপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে ;—

গুহা মনোভবা তত্র মনোভববিনির্ম্মিতা।
মনোভবগুহাতত্র পঞ্চব্যাসায়তাস্তথা॥
রক্তমণ্ডল সংযুক্তাং রক্তবর্ণাং সুবর্ত্তুলাম্।
যোনিস্তস্যাং শিলায়াস্তু শিলারূপা মনোহরা॥

তথায় কামদেব নির্ম্মিত মনোভব গুহা। সেই গুহা পঞ্চব্যাস আয়তা, রক্তবর্ণা, বর্ত্তুলাকারা ও রক্তমণ্ডল সংযুক্তা। এই শিলাতেই মনোহরা শিলারূপিণী জননী—দেবী বিরাজমানা।

এই স্থানে কালী, কামাখ্যা, জয়দুর্গা, বনদুর্গা, মাতঙ্গী, কমলা, ধূমাবতী, বগলা, ছিন্নমস্তা এই নব যোনিপীঠ দর্শন করিতে হয়। এই স্থানে কোটালিঙ্গ, সিদ্ধেশ্বর, হেরুকেশ্বর, হেরুক ও টোকোরেশ্বর এই পঞ্চ শিব আছেন। এই স্থানে তারাবাড়ী ব্রহ্মানন্দ গিরি স্থাপন করেন। এই কালীবাড়ী উগ্রতারা ভট্টাচার্য্য স্থাপন করেন। এই কালীবাড়ীতে দশনামা সন্ন্যাসীর আখেড়া। তথায় ভগবান দত্তাত্রেয়ের পাদুকা অর্চ্চিত হয়।

এই স্থানে ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে সাধক-কুলতিলক নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী সাধনা করিতেন। তাঁহার তপপ্রভাবে এই নীলাচল সমুজ্জ্বল ছিল। শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী নামে ভক্তিগ্রন্থ এই স্থানে সৌভাগ্য-কুণ্ডতীরে প্রথম আরম্ভ হয়। তেজপুর হইতে সমাগত, অতিবৃদ্ধ রত্নগিরি এই স্থানে, প্রথমে কালীতত্ত্ব বা শক্তিতত্ত্ব বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। ওঙ্কারনাথ মণ্ডলীর গুরুমহারাজ শ্রীশ্রীপূর্ণানন্দ স্বামী এই স্থানে মণ্ডলাসঙ্গে মন্দিরের পার্শ্বস্থ সমতলক্ষেত্রে উপবেশন করিয়া, কখন সৌভাগ্য কুণ্ডতীরে বসিয়া শ্রীশ্রীকালীনামের উচ্ছ্বাস কীর্ত্তন ব্যখ্যাদি শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীসর্ব্বানন্দ সর্ব্ববিদ্যা এই স্থানে জগজ্জননীর আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই পুণ্যক্ষেত্রে ব্রহ্ম-

পুত্রের চরের উপরে, মৃতহস্তীর চর্ম্মাবৃত উদরের মধ্যে বসিয়া জগজ্জননীর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। রাম এই স্থানে সিদ্ধিলাভ করেন। এই পুণ্যতীর্থ মন্ত্রসিদ্ধির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান। এখন সাধক নাই, সাধনাও নাই ;—সিদ্ধিলাভের পিপাসাও নাই। যে কর্ম্মের যে কর্ম্মী নহে, সে কর্ম্মের মর্ম্মও সে বুঝিতে পারে না। অসাধক সাধনার ক্রিয়া কৌশল আরম্ভ করিলে ব্যভিচার ঘটা স্বাভাবিক। মহাতীর্থ কামাখ্যায় সাধনার নামে ব্যভিচার অসম্ভব নহে। তজ্জন্য মহাতীর্থের মাহাত্ম্য হ্রাস হয় নাই। পুণ্যপ্রভা ম্রিয়মান হয় নাই, বিশ্বজননীর করুণা লাভের ব্যাঘাত ঘটে নাই। যাঁহারা সাধক, যাঁহারা ভক্ত, তাঁহাদের ভক্তি বিশ্বাস বিচলিত হয় নাই।

মন্দিরের মধ্যে প্রস্তরফলকে লিখিত আছে :—

"লোকানুগ্রহকারকঃ করুণয়া পার্থোধনুর্ব্বিদ্যয়া
দানেনাপি দধীচি কর্ণসদৃশো মর্য্যাদয়াম্ভোনিধিঃ।
নানাশাস্ত্রবিচার চারুচরিতঃ কন্দর্পরূপোজ্জ্বলঃ
কামাখ্যাচরণার্চ্চকো বিজয়তে শ্রীমল্লদেবো নৃপঃ॥
প্রাসাদমদ্রিদুহিতুশ্চরণারবিন্দ,
ভক্ত্যা করতু তদনুজবর নীলশৈলে।
শ্রীশুক্লদেব ইমমূল্য সিতোপলেন
শাকে তুরঙ্গ গজবেদ শশাঙ্ক সংখ্যে॥
তস্যৈব প্রিয়সোদরঃ পৃথুযশা বীরেন্দ্র মৌলিস্থলী,
মানিক্যং ভজমান কল্পবিটপীনীলশৈলে মঞ্জুনং।
প্রাসাদ মুনিনাগবেদ শশভৃচ্ছাকে শিলারাজভিঃ
দেবীভক্তি মতাম্বরো রচিতবান্ শ্রীশুক্ল পূর্ব্বধ্বজ॥"

নাট মন্দিরের দেওয়ালে প্রস্তরফলকে লিখিত আছে ;—

"৺ স্বস্তি। কামাখ্যাচরণাম্বুজার্চ্চনাপরো ধর্ম্মেন ধর্ম্মোপমো।
রূপেণাপ্পিত পঞ্চশায়ক মদঃস্বর্গেশবংশোদ্ভবঃ॥

দিক্‌চক্র ভ্রমণপ্রবীন বিলসৎকুন্দোল্লসদ্যশাঃ।
শ্রীরাজেশ্বর সিংহ ভূপতিবর ভূলোককল্পদ্রুমঃ॥
যো ভূপালস্ত মৌলী রত্নবিলসৎ পাদারবিন্দদ্বয়োঃ।
ভূভৃন্নাতি লতৌঘ নূতনঘনঃ কোদণ্ডবিদ্যার্জ্জুনঃ।
পারাবার গভীর উর্জ্জিত তরাদিত্য প্রতাপমহা-
দোর্দ্দণ্ডাতি প্রচণ্ড বৈরীনিবহ প্রোদ্দাম দাবানলঃ
তস্যাজ্ঞাদধদাদরেণ শিরসি স্বর্গাবরোহাবধি
স্বর্গেশান্বয় ভূপসেবিদ্বরবংশ্যোত্র নীলাচলে।
কামাখ্যাঙ্ঘ্রি পরায়ণো দশরথঃ শ্রীযুদ্ধ্‌হৎ ফুক্কনঃ
কামাখ্যাং স্মরমন্দিরং ক্ষিতিবসুস্বাদেন্দু শাকেঽকরোৎ॥
১৬৮১"

স্বামী অভিরানন্দ সরস্বতী, জন্মস্থান বর্দ্ধমানের অন্তর্গত খণ্ডকোষে; নাম ছিল আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১২৯৯ সালে জন্মস্থান হইতে বাহির হইয়া আর সেখানে যান নাই। কুমিল্লার পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর গোবিন্দবাবু (১৩১৬ সালে) বলেন, "আমি স্বামীজীকে জানি; পুলিশ রিপোর্টে তাঁর বয়স একশ একাত্তর বছর; আমার কাকা তাঁর শিষ্য। বিশেষ বিশেষ ভ্রমণকারী মহাপুরুষগণের পরিচয় পুলিশের খাতায় লেখা আছে।"

খাকীবাবা স্বামীজীর সতীর্থ। উভয়ে ওঙ্কারনাথে যাইয়া পূর্ণানন্দ স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কাশীধামের উলঙ্গ স্বামী ভাস্করানন্দও পূর্ণানন্দ স্বামীর শিষ্য। অভিরানন্দের সঙ্গে ভাস্করানন্দের বন্ধুত্ব ছিল। খাকীবাবার সঙ্গে ভুলুয়াবাবার পরিচয় কলিকাতায় হয়। ক্যাম্বেলের ভূতপূর্ব্ব এনাটমীর প্রফেসর চন্দ্র মোহন ঘোষ ভুলুয়াবাবার একজন সেবক ছিলেন। স্থকিয়া ষ্ট্রীটে

চন্দ্রমোহনবাবুর বাড়ী। ভুলুয়াবাবা প্রায়ই সেখানে থাকিতেন। তখন খাকীবাবার নাম দেশের মধ্যে বিখ্যাত ছিল। চন্দ্রমোহন বাবুর বাড়ীতে খাকীবাবার নিকটে আভীরানন্দের সম্বন্ধে অনেক কথা জানা গিয়াছিল।

১৩০৬ সালে খাকীবাবার সঙ্গে ভুলুয়াবাবার প্রথম পরিচয়। তখন জনপ্রবাদে খাকীবাবার বয়স দেড়শত বছর। খুব বৃদ্ধ হইলেও এ বাসা হইতে ও বাসা হাঁটিয়া যাইতেন।

ধুবড়ীর উকীল ধর্ম্মপ্রাণ বাবু পিয়ারিচরণ সেন আভীরানন্দের পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি ধুবড়ীর ধর্ম্মসভার সম্পাদক ছিলেন। প্রিয়লাল গঙ্গোপাধ্যায় ডিষ্ট্রিক্ট ইন্‌জিনিয়ার স্বামীজীর শিষ্য ছিলেন। প্রিয়বাবু সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাস নিয়া স্বামীজীর সঙ্গে ছিলেন। সন্ন্যাসের নাম প্রেমানন্দ স্বামী। আভীরানন্দের সঙ্গে সর্ব্বদাই বিশ পঁচিশ জন শিষ্য থাকিতেন।

বৃষ্টি না নামিলে স্বামীজী ঘরে উঠিতেন না। বৃক্ষতলে বাস করিতেন।

তিনি তন্ত্রশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত ছিলেন। পণ্ডিত ও সাধক শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, ভবানীপুরের গোপাল ব্রহ্মচারী, হরানন্দ সরস্বতী, রাজেন্দ্র গোঁসাই প্রভৃতি স্বামীজীর নিকটে তন্ত্র বিষয়ক অনেক তত্ত্ব শিক্ষা করেন।

স্বামীজীর বিচারে সমগ্র কামরূপ ক্ষেত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ। তিনি দেহত্যাগের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে এক কামরূপ ভিন্ন অন্য কোন তীর্থে গমন করেন নাই। ১৩৩২ সালে ভাদ্রমাসে দিক্রাং নদীর (দিক্রং বাসিনীর) পবিত্র তীরে একশত পঁচাশী বৎসর বয়সে শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

স্বামী আভীরানন্দ কুলাচারী তান্ত্রিক ছিলেন। মৎস্য মাংস ভোজন করিতেন। ভৈরবী পূজা করিতেন; কুমারী পূজায় তাঁহার

জাতি বিচার ছিল না। পুরোহিত দিয়া পূজার খুব পক্ষপাতী ছিলেন না। কোন ব্রাহ্মণ যাত্রাপুরে এক পুরোহিত দিয়া কালীপূজা করিতে ছিলেন। তাহাকে পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলেন—"তোমার এই পূজা এবং দোকান-প্রিয় একদল ব্যবসায়ী আছে তাহাদের বিবাহ প্রায় সমান। ক্ষত্রিয়েরা পূর্ব্বে তরবার পাঠাইয়া বিবাহ করিত। তাহারা দোকানে খুব বেচা-কেনার ভিড় পড়িলে কাপড় মাপা গজ পাঠাইয়া দেয়। গজের সঙ্গে বিবাহ হয়। স্ত্রী শেষে পাঁচ সাত বছর পরে দুই চারিটী ছেলে পিলে সাথে করিয়া বাসায় আসে। তোমারও এই বরাতি পূজায় মা বরাভয় সঙ্গে করিয়া দুচার বছর পরে তোমার বাড়ী আসিবেন। ব্রাহ্মণ হইয়া মার সেবাপূজা পরকে দিয়া করাও, লজ্জা করে না?—নিজের উপাসনা নিজেই কর, নিজের পূজা নিজেই কর। উপাসনায় বরাত চলে না। হিন্দু জাতির উপাসনা ববাতি, তাই দুর্গতি।"

আভীরানন্দ ভুলুয়াবাবাকে স্নেহ করিতেন। তন্ত্র ও সাধনা সম্বন্ধে ভুলুয়াবাবা অনেক উপদেশ তাঁহার নিকটে শিক্ষা করেন।

তিনি বলিতেন, সমগ্র পৃথিবীতে একমাত্র শক্তিপূজা। প্রবল শক্তিকে দুর্ব্বল শক্তি উপাসনা করে। পরমেশ্বর প্রবল শক্তি, মহা মহীয়সী শক্তি—জগৎ তাই তাঁর পূজা করে। তিনি সহিষ্ণু ছিলেন, ভক্তিমান ছিলেন, জ্ঞানী ছিলেন এবং উপাসনায় জাতিভেদের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি ভুলুয়াবাবার নিম্নলিখিত গানটী প্রায়ই গান করিতেন।

"মার নামে নালিশ করেছে।
বিশ্বনাথের বিচারালয়ে মোকদ্দমা হতেছে॥
দুখহারিণী খেতাব নিয়ে সন্তানে দুখ দিয়াছে।
মা নামের গৌরব নাশি অপরাধী হয়েছে॥

স্নেহময়ীর আসন নিয়ে পাষাণ হয়ে বসেছে।
তাই অবিচারের বিচার হবে দেখিতে লোক ছুটেছে ॥
বরাভয় সর্ব্বদা দিবে শিবের এই ঘোষণা আছে।
এখন, অভয়দানে কৃপণা হয়ে, শিবের আইন লঙ্ঘেছে ॥
শিবকে করেছে মিথ্যাবাদী, শিবের মান্য গিয়াছে।
করি আইনভঙ্গ মান্যহানী, বড় সঙ্কটে মা পড়েছে ॥
ভবের যত সন্তান জুঠে মোকদ্দমা করেছে।
মার বিপক্ষে উকীল এবার ভুলুয়া নিজেই হয়েছে ॥

(বেহাগ।)

স্বর্গীয় গোবিন্দপ্রসাদ রায়, কুচবিহারে উকীল ছিলেন। পুরুষানুক্রমে অতিথিসেবা-পরায়ণ। সাধুসজ্জন কুচবিহারে গমন করিলেই তিনি তাঁহাদিগকে-অভ্যর্থনা করিতেন। অত্যন্ত করুণ-হৃদয়। তিনি কখনও কাহারও প্রতি উচ্চ কথা কহিতে জানিতেন না। তাঁহার সৌজন্যে স্বর্গীয় মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর এতই বিমুগ্ধ ছিলেন যে মধ্যে মধ্যে তাঁহার গৃহে আসিয়া ভোজন করিতেন। এক সময় কুচবিহারে জনসাধারণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র এখন বর্ত্তমান আছেন। বাবু অন্নদাপ্রসাদ রায় জ্যেষ্ঠ, বাবু নগেন্দ্রপ্রসাদ রায় মধ্যম এবং বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ রায় কনিষ্ঠ। বাবু নগেন্দ্রপ্রসাদ রায় এখন সহকারী জজ। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ রায় এখন গবর্ণমেণ্ট উকীল। অন্নদাবাবু পেন্‌সেন প্রাপ্ত।

তাঁহারা সকলেই পৈতৃক সদ্‌গুণের উত্তরাধিকারী। সকলেই ধর্ম্মপ্রাণ অতিথি সেবাপরায়ণ এবং নিরহঙ্কার। তাঁহারা সর্ব্বজনপ্রিয়।

ভুলুয়াবাবা গোবিন্দবাবুর গৃহে থাকিয়া তিন বৎসর কলেজে অধ্যয়ন করেন। গোবিন্দবাবু সজ্ঞানে সাধকের মত দেহত্যাগ করেন।

শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়,

জন্মস্থান কলিকাতার নিকটবর্ত্তী নারায়নপুরে ছিল এখন ৮নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটে। তিনি দীর্ঘকাল হইতে ভুলুয়াবাবার গুণ-পক্ষপাতী। যখন মাগুরায় মুন্সেফ ছিলেন, তখন ডেঃ মাঃ বাবু শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় ভুলুয়াবাবাকে মাগুরায় লইয়া যান। ফণীবাবু ভুলুয়াবাবার পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হন। তখন ভুলুয়াবাবার "ঢাকা দক্ষিণ" নামক গ্রন্থ ফণীবাবু প্রথম প্রকাশ করেন।

ফণীবাবু কুমিল্লায় যখন মুন্সেফ ছিলেন, তখন শ্রীশ্রীকালীকুল-কুণ্ডলিনী, প্রথম খণ্ড প্রকাশের ভার তিনি বহন করেন। তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণ স্বভাব, নিরহঙ্কারিতা এবং পর দুঃখকাতরতা সর্ব্বোপরি প্রশংসনীয়।

তিনি শরৎবাবুর শিষ্য। শরৎবাবু শ্রীহট্টে বেগমপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। দেবীযুদ্ধ গ্রন্থ শরৎবাবুর লেখা। তিনি মাতৃভাবের শ্রেষ্ঠ সাধক, শ্রীহট্টের গৌরব, স্বদেশ এবং স্বজাতির কল্যাণকর কর্ম্মে অগ্রবর্ত্তী মহাপুরুষ। সম্প্রতি ফণীবাবু তাহাকে নিজ গৃহে রাখিয়া আচার্য্য-সেবার তপস্যা করিতেছেন।

ফণীবাবু শিশুকালে বন্দুকের ছর্‌রা বারুদ গিলিয়া ফেলেন, কিন্তু কোন অমঙ্গল ঘটে নাই। অতি শৈশবে বানরে তাঁহাকে লইয়া ঘরের চালে উঠে, কিন্তু ফেলিয়া দেয় নাই। এই সকল ভাবী শ্রেষ্ঠত্বের পূর্ব্ব পরিচয়। তিনি যে ভবিষ্যতে মনুষ্যত্বের উচ্চস্থান অধিকার করিবেন, শৈশবে তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল।

তিনি চাকুরির ক্ষেত্রেও যোগ্যতার পরিচয় দিয়া উচ্চতম পদে উন্নীত হইয়াছেন। মুন্সেফ হইতে ডিষ্ট্রীক্ট্ সেসেন্ জজ হইয়াছেন। যাহা মুন্সেফগণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

তিনি তমলুকে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের উন্নতিকল্পে অনেক পরিশ্রম করেন। সম্প্রতি তিনি মেদেনীপুরে সেসন জজ। সর্ব্বত্র তিনি যোগ্য বলিয়া প্রশংসিত।

পণ্ডিত জগচ্চন্দ্র, ইঁহার জন্মস্থান ধর্ম্মদহে। মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত। ইঁহার সদ্‌গুণে বিমুগ্ধ হইয়া শাস্ত্রজ্ঞান ও সদাচার দর্শন করিয়া বহু সম্ভ্রান্ত ধর্ম্মপিপাসু লোক ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৩৩৩ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে ইনি হাওড়ার অন্তর্গত মৌরী গ্রামে দেহ রক্ষা করেন। ভুলুয়াবাবার সঙ্গে ইঁহার অত্যন্ত সৌহার্দ্দ ছিল। ইনি যেমন তত্ত্বদর্শী, তেমন ভক্তিমান, তেমন শাস্ত্রাচারী বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণত্বের পক্ষপাতী ছিলেন।

জয়দুর্গা মা, ইনি গৃহে বসিয়া উগ্র তপস্বিনী। ভুলুয়াবাবা ইঁহাকে জননী বলিয়া সম্বোধন করেন। সাহেবগঞ্জের সাধুবাবার শিষ্যা। এখন বয়ঃক্রম আশী বৎসর। কিন্তু তপস্যার প্রভাবে এমন শক্তিমতী যে নিজে হাতে দুবেলা রান্না করিয়া সকলকে ভোজন করাইতে কষ্টবোধ করেন না। স্ত্রীলোক দেখিলেই তাহাকে বলেন "পাতিব্রত্য ও সতীত্বই স্ত্রীজাতির গৌরব। মা-নাম মহামন্ত্র আশ্রয় কর। মাতৃভাব সম্বল কর। আর জগতের মা হইয়া রমণী-জন্মের গৌরব রাখ।" ঈশ্বরদার রেলওয়ে ডাক্তার সংযমী-প্রধান গুপ্তাবধৌত শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইঁহার পুত্র। সম্প্রতি মা সেখানেই থাকেন। ইনি তপস্যার মূর্ত্তি।

পরিশিষ্ট সমাপ্ত।